রঙীন সাঁকো

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৬৭

দ্বিতীয় মুদ্রণ

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন : আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ : চয়নিকা প্রেস

মিত্র, ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে
কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ শশী প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে
সোম কর্তৃক মুদ্রিত

'রা স্বা'

শ্রী প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

শ্রীমতী ম্যারিঅ্যান্ দাশগুপ্ত

করকমলেষু

দুজনের হাতে দুটো স্যুটকেস। একজন লম্বা ক্যাকাশে চেহারার যুবক, অন্যজন একটু বেঁটে। মাথার চুল পাতলা, স্বাস্থ্যটা একটু থল্‌থলে।

দুপুরে স্টেশন ফাঁকাই বলা যায়, চেকার-কেকার কিছু নেই, প্ল্যাটফর্মেও কোনো বেড়া নেই, উদোম প্ল্যাটফর্মটা দুজনে মন্থর পায়ে পার হল। হাতে ধরা টিকিট, কিন্তু টিকিট নেওয়ার কেউ নেই দেখে লম্বাজন টিকিটটা দুমড়ে ফেলে দিল, তারপর দুজনেই প্ল্যাটফর্ম থেকে রেল লাইনে নেমে এল। লাইনের পাশ দিয়ে পায়ে হাঁটা পথ গেছে, সেটা ধরে হাঁটতে লাগল। পাশাপাশি হাঁটা যায় না, এর স্যুটকেসে ওর হাঁটু লাগে, তাই লম্বাজন সামনে আর বেঁটেজন পিছনে হাঁটতে থাকে।

লম্বাজন মুখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞেস করে—সিগারেট আর আছে নাকি রে গন্‌কট?

—দাঁড়া, দেখি।

বলে বেঁটেজন পকেট হাতড়ে একটা দোমড়ানো প্যাকেট বের করে, স্যুটকেস নামিয়ে রেখে প্যাকেটটা খুলে দেখে বলে—মাইরি, ঠিক দুটো আছে, লাস্ট্ দুটো।

লম্বাজন বাতাসে তার উড়ন্ত দীর্ঘ চুল হাত চেপে ঠিক করতে করতে বলে—কপাল। দে।

দুজনে সিগারেট ধরায়, আবার হাঁটতে হাঁটতে বেঁটেজন বলে—দূর রে সিন্ধু?

—বলেছি তো মাইলখানেক।

হাঁটবি? না রিক্সা নিবি?

ক্যাকাশে জন আপনমনে একটু হাসে- গন্‌কট, কী কথা

বলে। তারপর বেঁটেজনের পাশে রিক্সার সীটে উঠে বসে। কাঁচা রাস্তায় ঝাঁকুনি খেয়ে রিক্সা ধীরে এগোয়।

জায়গাটা দিব্বি সবুজ। তাজা বাতাস বইছে। শীতের এখনো তেমন টান নেই এদিকে, তবু বাতাসটা দিয়েছে জোর। ডান ধারে একটা বাঁশবন, মড়মড় করে মাথা নুইয়ে দিচ্ছে। একটা ঘাটহীন পুকুরের পাশে অশ্বত্থ গাছ। রাস্তাটা বেঁকে গেছে। রাঙচিতার বেড়া, ভাঁটবন, পুরোনো পুরোনো সব গ্রাম্য বাড়ি, শীতলা মায়ের থান, একটা চণ্ডীমণ্ডপ। বেঁটেজন মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। উত্তর বাংলার যে শহর থেকে তারা এসেছে সেটাতেও এমন ঘন ঝোপঝাড়, সবুজ গাছপালা, পুকুর বা গ্রাম্য বাড়ি নেই।

লম্বাজন যতদূর সম্ভব পিছনে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজে ছিল। ঐভাবেই বলল—গনকট, টেণ্ডারটা যদি না পাই তবে রাহা খরচটা গচ্চা গেল।

বেঁটেজন চুপ করে রইল খানিক, তারপর আস্তে আস্তে বলল—সিন্ধু, আমার কী মনে হয় জানিস?

—কী?

—মনে হয় তুই একটা মাড়োয়ারী, আর আমিই বাঙালী।

লম্বাজন হাসে। কিছু বলে না। বেঁটেজনই আবার বলে—ব্যবসার সঙ্গে লাইফটাকে পাঞ্চ্ করতে শেখ্ সিন্ধু! তোর বদস্বভাব হচ্ছে এই যে, তোর নেশাটা নীট নেশা, পাঞ্চ্ করতে জানিস না।

লম্বাজন চোখ বুজে থাকে। ভাবে। তারপর বলে—তোর বদস্বভাব কী জানিস?

—কী?

—তুই যে একসময়ে কলকাতায় পড়তে এসে নাটক-নাটক করে পাগল হয়েছিলি সেইটে ভুলতে পারিস না। বাংলা নাটকের দ[illegible] করে কালচারাল মুভমেণ্ট্ করে তোর ব্যবসার মাথা নষ্ট [illegible]

—গেছে তো গেছে।

—মাড়োয়ারী এখন বাঙালী হয় তখন তার বড় [illegible]

—আর বাঙালী যখন মাড়োয়ারী হয় তখন ?

—তখনই তো বাঙালীর উন্নতি।

বেঁটেজন অবিরল হাসল। দুলে দুলে। চোখে জল এসে গিয়েছিল, রুমালে চোখ মুছে বলল—তাহলে আয়, আমি তোর বোনকে বিয়ে করি, তুই আমার বোনকে বিয়ে কর। আমাদের পরের জেনারেশনটা খিচুরি হয়ে যাক। ও হো, তোর তো আর বোনও নেই !

—দূর শালা মেড়ো, থাকলেই তোর হাতে দিতাম নাকি ?

—ওরে ব্যাটা ভেতো বাঙালী, দিলেও নিতাম নাকি ?

লম্বাজন স্মিতমুখে চোখ বুজে ছিল। হঠাৎ দেশলাইয়ের শব্দে চোখ খুলে দেখে বেঁটেজন সিগারেট ধরাচ্ছে। লাফিয়ে উঠে বলে—এই শালা, বললি যে শেষ দুটো সিগারেট ছিল, এখন পেলি কোথা ?

—কোথায় আবার ! রেল লাইনের ঐ বাতাসের মধ্যে কেউ সিগারেট খেতে পারে ? তাই নখ দিয়ে টিপে নিভিয়ে কানে গুঁজে রেখেছিলাম, সেই আদ্দেকটা খাচ্ছি।

লম্বাজন বিস্ফারিত চোখে চেয়ে বলে—গনফট !

—উঁ ?

—তুই মাড়োয়ারীই বটে।

—বটেই তো, কে বারণ করেছে ? চাস তো দুটো টান দেবো'খন।

—দিস। শ্বাস ছেড়ে লম্বাজন আবার চোখ বোজে।

কিছুক্ষণ পর বেঁটেজন বলে—সিন্ধু !

—উঁ ?

—তোর দাদা মরতে এ কোথায় বাড়ি করেছে ? রাস্তা যে ফুরায় না।

—একটু দূর।

—একটু ! বলিস কী ? তোর দাদা এত দূর থেকে রোজ যায় আসে ?

—দাদার সাইকেল আছে।

—থাকলেই বা।

লম্বাজন চুপ করে থাকে।

বেঁটেজন আবার বলে—এ জায়গাটা হাওড়া থে
বললি ?

—আট কিলোমিটার।

—কলকাতার এত কাছে তবু কোনো ডেভেলপমেণ্ট হ

—হয়নি কী করে বলছিস ? চাঁদপুরের উদ্বাস্তুরা অপারেটিভ কলোনী করেছিল তখন পুরো জায়গাটা আর জঙ্গল। হাসিল করে পত্তন করেছিল। তখনকার তো দশগুণ ডেভেলপ্‌ড্‌। আরও হবে।

বেঁটেজন সিগারেটের শেষ অংশটা এগিয়ে দিয়ে বে
করে টানিস।

লম্বাজন বেঁটেজনের কথামতো সিগারেটটা মুখে না চ
মুঠো করে টানতে থাকে।

বেঁটেজন—সিন্ধু, তোর দাদা ইচ্ছে করলে কলকাতা
করতে পারত। এত দূরে বাড়ি করার মানে হয় না।

লম্বাজন চোখ বুজে বলে—পারত। তবে যে টাকায় এ
কাঠা জমি কিনেছে সে টাকায় কলকাতায় দেড় কাঠাও
সন্দেহ। তখন দাদার অবস্থা এত ভাল ছিল না।

—দশ কাঠা তো অনেক জমি! তোর দাদার
ফ্যামিলি।

—হলে কী হবে! দাদার বাতিক গরু পুষবে,
করবে, একটা পুকুর কাটারও কথা ছিল, তা সেটা আর হয়

বলতে বলতে লম্বাজন একটু দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। তারপর
বলে—বুঝলি গনকট, দাদা শেষ পর্যন্ত এদিককারই লোক হ
পরিবারটা আর জোড়া লাগবে না।

—কেন, তোর দাদা তো শিলিগুড়িতে যায়।

—সে কদাচিৎ, অতিথির মতো গিয়ে থেকে চলে আসে। বাবা খুব দুঃখ করে বলে—এত কষ্ট করে বাড়িটা করলাম, তা বড় ছেলেটা সে বাড়ি ভোগ করল না। পর হয়ে গেল। এদিকে জমিজায়গা করে শেকড় গেড়ে ফেলেছে।

—ভালই করেছে রে সিন্ধু। আমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলিতে যা চেঁচামেচি, টেঁকা যায় না।

—আমাদের পরিবার তো তোদের মতো নয়। আমরা মোটে দুটি ভাই। দু বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বাড়িতে কেবল মা, বাবা আর আমি। বাড়িটা ফাঁকা পড়ে থাকে।

—বাঃ, এরকমই চিরকাল থাকবে ? তোর দাদা বিয়ে করেছে, তুইও করবি, তোদের ছেলেপুলে হবে, তখন ফ্যামিলি বাড়বে, খিটিমিটি হবে, ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে কাজিয়া হবে। তার চেয়ে তোর দাদা আগে থেকে আলাদা হয়ে বুদ্ধির কাজ করেছে।

লম্বাজন চোখ বুজে চুপ করে থাকে। তারপর আস্তে করে বলে —সেই কথা ভেবেই আমি মা-বাবাকে বলে দিয়েছিলাম যে আমি বিয়েই করব না। বাড়ির স্বত্বও ছেড়ে দেবো বলেছিলাম। সেটা শুনে দাদা বাবাকে জানাল যে সেও বাড়ির স্বত্ব আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। দুই ভাইয়ে ত্যাগের কম্পিটিশন লাগে আর কী !

বেঁটেজন—তোদের খুব মিল।

লম্বাজন—ছিল। এখন আর তেমন নেই।

—কেন ?

—দাদাটা বদলে গেছে।

দুদিক থেকে গাছপালার ডাল আর পাতা এগিয়ে এসে রাস্তাটাকে চেপে ধরেছে। রিক্সার হুড-এ ছট্‌ছট্ লাগছে। ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যায়। বুনো গন্ধ।

—জায়গাটা মন্দ নয় রে সিন্ধু। তবে দূর। তোর দাদার ইস্কুল তো কালীঘাটে, এখান থেকে যেতে অনেক সময় লাগে নিশ্চয়ই !

—তা লাগে। তবে বড্ড কষ্টসহিষ্ণু। একসময়ে তো দাদা

কালীঘাটে বাসা করে ছিল। সেই বাড়িওয়ালা দাদাকে তুলবার জন্য রোজ বৌকে লেলিয়ে দিত, ছোটলোক বৌটা দাদা-বৌদিকে না হক খারাপ গালাগাল দিত ওপরতলা থেকে, দাদা তখন কবি মানুষ, দুটো বই ছেড়েছে বাজারে, পত্রপত্রিকায় ওর লেখা ছাপা হয়। আড্ডাবাজ মানুষ, সংসারে মন নেই, সঞ্চয় নেই, টাকাপয়সা চেনেই না, তার ওপর ভীতু, ইম্প্র্যাক্টিক্যাল, কাজেই বাড়িওলার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না। কম ভাড়ায় ছিল, বাড়িওয়ালার গুণ্ডা ভাইপো দাদাকে প্রায়ই শাসাতে লাগল। ভয় খেয়ে দাদা তখন উঠে যায়, বাসা পাওয়া গেল না, কসবার দিকে একটা প্রায় বস্তির মতো বাড়িতে উঠে গেল। এই ঘটনা থেকেই দাদার পরিবর্তন শুরু হয়, বৌদিরও। বাড়িওলার অত্যাচার দেখে দুজনেই ঠিক করল যেখানে হোক, যেমন করে হোক একটা বাড়ি করবে। বাড়ি-বাড়ি করে করে দুজনেই তখন পাগল। না খেয়ে কষ্ট করে একটি দুটি করে টাকা জমাতে থাকে, দাদা টিউশনি করত, সে-সব ছেড়ে দিল। এক বন্ধুর সঙ্গে ওয়ার্কিং পার্টনার হয়ে তার কোম্পানীতে ভূতের মতো খাটত, তার ওপর ইস্কুল। পেটে খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই। দু'বছর বাড়ি গেল না, রেল ভাড়ার টাকা জমাল। কবিতা-টবিতা তখন ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেছে মাথা থেকে। টানা তিন-চার বছর ঐভাবে খেটে গেল দাদা, উড়ু উড়ু উদাসী মানুষটা হয়ে গেল বস্তুবাদী, সঞ্চয়ী। সমবায় পল্লীতে ওর দূর সম্পর্কের এক মামাশ্বশুর আছে, সে-ই দাদাকে অবশেষে জমি কিনে দিল। সস্তায়। দাদা বাড়ি করল। গৃহপ্রবেশে আমরা এসেছিলাম, বাড়ি দেখে কান্না পেল, মাটির ভিতরে ইট সাজানো, সিমেন্টের পয়সা কুলোয়নি, টিনের চাল, টিনের বেড়া, তবু দাদা-বৌদির মুখে যে কী বিজয়ীর আনন্দ! তারপর দাদা সে বাড়ি ভেঙে এখন দোতলা তুলেছে। হরিয়ানার গরু কিনেছে দেড় হাজার টাকায়। গুছিয়ে বসেছে। বন্ধুর কোম্পানীটাও দাঁড়িয়ে গেছে। সি-এম-ডি-এ-র কাজ করে বিস্তর কামায়। ইচ্ছে করলে ইস্কুলের চাকরি ছেড়ে দিতে পারে,

তবু দেয়নি কেন তা ও-ই জানে। তবু বুঝলি গনকট, দাদার এই উন্নতি আমরা কেউ চাইনি।

—কেন ?

—এর চেয়ে সেই দাদাই ভাল ছিল। ধারকর্জ করে সংসার চালাত, বছরে দুটো ছুটিতে বাড়ি গিয়ে হৈ-চৈ করত, বড় বড় কাগজে দাদার কবিতা বেরোতো। কবিতা বেরোলে আমাদের বাড়িতে একটা উৎসব পড়ে যেত। সেই গরীব, উদাসী, কবি দাদা আর কোথায় পাবো ?

বেঁটেঞ্জন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। বলে—তবু সিন্ধু, তুই আমাকে খামোকা গাল পারিস, আমি ব্যবসাদার নই বলে। আমার মাথায় যে কালচারাল মুভমেণ্ট ঢুকেছিল আজও তার ভূত আমাকে ছাড়েনি। আমি আমার বাপ-দাদার মতো হতে চাইছি, পারছি না। কী ভাবে ভূতটা তাড়ানো যায়, তোর দাদার কাছে শিখে যাবো।

ডানধারে 'বনমালীর তেলেভাজার দোকান', তারপর একটা মুদীখানা, তারপর আরো দুটো মোড় ঘুরে রিক্সা ফাঁকা জায়গায় উঠে এল। হঠাৎ চোখের সামনে প্রকাণ্ড দুটো দীঘি ভেসে ওঠে। দীঘির চারধারে ঘিরে সব বাড়ি জলে ছায়া ফেলে আছে। চমৎকার দৃশ্যটি দেখে বেঁটেঞ্জন বলে ওঠে—আরে বাঃ সিন্ধু, এ তো বিলিতি টাউনশিপ !

—হুঁঃ। তবে এখানকার জল পেটে গেলেই আমাশা, আর মশার হোল্‌সেল্‌ আড়ৎ।

জোড়াদীঘির মাঝখান দিয়ে উঁচু রাস্তা বেয়ে রিক্সাটা পশ্চিমধারের একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল।

॥ দুই ॥

গরু দোয়ানো হচ্ছে বাড়ির পিছন দিকটায়। সেইখানে দাঁড়িয়েছিল কমলা। মুখখানা গম্ভীর, অন্যমনস্ক। কাজ করার [illegible] মেয়েটা এসে বলল—বৌদি, কে এসেছে দেখ গে !

—কে রে ?

—আমি চিনি নাকি ? দুজন, হাতে বাক্স।

যে লোকটা দোয়াচ্ছিল সে বালতি এগিয়ে হাঁটুর গামছা খুলতে খুলতে বলল—এবার দুধ কম হচ্ছে মা। তিন সেরও হবে না। গাহেক কমাতে হবে।

কমলা একটা শ্বাস ফেলল। নিজেদের দুধ একটা আলাদা আলুমিনিয়ামের ডেকচিতে তুলে রেখে বালতি সুদ্ধু দুধে খানিকটা পরিষ্কার জল ঢেলে বাচ্চা মেয়েটাকে বলে—পুনি, দুধ নিয়ে বেরো। গাঙ্গুলীবাড়ি আর মহলানবীশদের বলিস সামনের হপ্তা থেকে দুধ আর এক সের করে দেওয়া যাবে না।

পুনি গম্ভীর মুখে বলে—কাল মহলানবীশদের বৌ আবার বলেছে, তোরা বড্ড জল দিস।

বিরক্ত হয়ে কমলা বলে—তাহলে ছেড়ে দিতে বলিস। অনেক গাহেক আছে।

দোয়ানোর লোকটা হাসল—তবে দুধ যত কম তত ঘন, বটের আঠার মতো। ঢের জল খাবে।

—তুমি যাও তো বাপু! সাঁজালটা দিয়ে যেও আর জাবনা।

দুধের ডেকচি রান্নাঘরের মিট্‌সেফ-এ রেখে কমলা সদরে এল। কাউকে দেখতে পেল না। ছেলেমেয়েরা খেলতে গেছে। বাড়িতে কেউ নেই এখন। লোক দুটো কোথায় গেল তা কাকে জিজ্ঞেস করবে ভেবে না পেয়ে বাগানের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেখল কেউ নেই। বাক্স হাতে যখন, নিশ্চয়ই তখন দূরের মানুষ।

ওপরতলা থেকে কে ডাকল—বৌদি!

চমকে ঘাড় ফিরিয়ে কমলা দোতলার বারান্দায় সিন্ধুকে দেখতে পায়। লম্বা চেহারাটা ঝুঁকে আছে রেলিং-এর ওপর, মুখে মস্ত হাসি।

—ওমা! সিন্ধু এসেছিস ? খবর দিসনি তো, যাচ্ছি দাঁড়া

—কোথায় ছিলে এতক্ষণ ? কাউকে না দেখে আমরা দো—

উঠে এসে চোরের মতো দাঁড়িয়ে আছি।

—আহা, ঢং! চোরের মতো আবার কী? এটা তোর দাদার বাড়ি না? গরুটা দোয়াচ্ছিল, সামনে ছিলাম।

—গাঁয়ের বধূ হয়ে গেলে বৌদি?

কমলা হাসল। মনে একটু মেঘ থেকেই গেল তবু।

উঠে এসে বারান্দায় মুখোমুখি হতে সিন্ধু এসে প্রণাম করে। তার সঙ্গে অচেনা লোক দেখে কমলা একটু জড়োসড়ো হয়ে যায়।

সিন্ধু বলে—ওকে তুমি চেনো বৌদি? বাজুরিয়াদের ছেলে গনপত। অনেককাল শিলিগুড়ি যাও না তো, তাই ভুলে গেছ বোধ হয়।

—না না, মনে আছে। আয়, জামাকাপড় ছাড়। ওপরের বাথরুমে জল দিতে বলছি।

—বাথরুম! বাথরুম দিয়ে কী হবে? সামনে দুটো প্রকাণ্ড দীঘি থাকতে—

—অবেলায় স্নান করবি?

—বলো কী! করব না! সাড়ে পাঁচশো কিলোমিটার ট্রেন-জার্নির পর শরীরটা কয়লা হয়ে আছে।

বাইরের ঘর পেরিয়ে ভিতরে আরো দুটো ঘর। সব ঘরেই কিছু কিছু ফুলের টব বসানো। সামনের দিকের কোণের ঘরখানায় সবচেয়ে বেশী। নানা বিচিত্র লতা পাতা গাছ ঘরের বাতাস স্যাঁত-স্যাঁতে করে রেখেছে। মেঝে ভেজা-ভেজা, দরজা-জানালায় বিচিত্র সব পর্দা। প্রতিটি ঘরের চার দেয়াল চার রকম রঙের। সিন্ধু হাঁ করে দেখছিল। অনেক পয়সার ব্যাপার। তা ছাড়া সে বুঝতেও পারছিল না ঘরে এত গাছগাছালি কেন!

—বৌদি, ঘরবাড়ি যে এগ্রিকালচারের শো-রুম হয়ে আছে। কী ব্যাপার?

—এমনিই। তোর দাদার শখ।

—অনেক টাকার ব্যাপার দেখছি। অনেক নতুন ফার্নিচার—

কমলা অন্য কথা বলে—কী খাবি ? লুচি করে দেবো ?

—করো, অনেকগুলো ভেজো, দারুণ খিদে।

ওরা গামছা আর সাবানের বাক্স নিয়ে পুকুরে গেল। কমলা ঘরের বাতি জ্বেলে একবার চেয়ে দেখল চারদিকে। সব ঘর ঘুরে দেখে নিল। কতদূর অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে তা বিচার করার চেষ্টা করল। অস্বীকার করার উপায় নেই, যে কোন বাইরের লোকের চোখে খট্‌কা লাগবেই, তাই আজকাল উপরতলায় কাউকে আনে না কমলা। কেউ এলে নীচের তলায় বসায়।

কিন্তু ঘরে গাছপালা লাগিয়ে, দেয়ালে বিচিত্র রং করেই যদি ক্ষান্ত থাকত সাগর ভবে কমলার বিপদ হত না। বাড়ির পিছন দিকে বাগানের এক কোণে সাগর যে কুটির তৈরী করছে সেটাতে যখন সাগর বসবাস শুরু করবে তখন সত্যিকারের বিপদে পড়বে কমলা। কী বলবে মানুষকে ?

সিন্ধু এক পলক দেখে। এখনো কিছু তেমন লক্ষ্য করেনি। কিন্তু করবে। সামনের কোণের দিকের ঘরটায় সাগরের আলাদা খাট, তাতে বিল্ট্-ইন অ্যাকুয়ারিয়াম, সেই অ্যাকুরিয়ামে ফাইটার, অ্যাঞ্জেল, গোল্ডফিশ এবং আরো বিচিত্র মাছেরা সামুদ্রিক শ্যাওলা আর জলজ উদ্ভিদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দু হাজার টাকা দামের খাট। অনেক খরচ করে ঘরটা সাউণ্ড প্রুফ করিয়েছে সাগর, লাগিয়েছে এয়ারকুলার। প্রতি ঘরে অন্তত সাত-আট রকমের বিচিত্র রঙের খাট। আলোর ডুম। সানমাইকা লাগানো বিশাল একটা লেখার টেবিল কিনেছে সাগর। গোছা গোছা দামী বণ্ড কাগজ। পাঁচ সাতটা মহার্ঘ্য বিদেশী কলম, চমৎকার কয়েকটা টেবিল-ল্যাম্প। টেবিলের টানায় লুকোনো থাকে দেশী বিলিতী মদের বোতল, পাঁচশোপঞ্চান্ন নম্বরী সিগারেটের গোটাকয়েক প্যাকেট। সিন্ধু সবই দেখবে। এসব লুকোনো যায় না।

—তোর চেহারাটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে সিন্ধু। খাওয়ার টেবিলে ওদের খেতে দিয়ে কমলা বলে।

গোগ্রাসে খেতে খেতে সিন্ধু একবার মুখ তুলে হাসল—আমার ছোট ব্যবসা, বড্ড খাটতে হয়। তার ওপর যেখানে সেখানে খাই সময়ের ঠিক থাকে না—

—ব্যবসাই করবি ?

—চাকরি দাও না, এক্ষুনি ব্যবসা ছেড়ে দেবো।

—চাকরি পাস না ? তুই তো এল. এম. ই. পাস !

—বি. ই-রাই বসে আছে তো এল. এম. ই. ! আমাদের ব্যাচের ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া তিনজন বসে আছে এখনো।

—বিয়ে করবি না ?

—কে মেয়ে দিচ্ছে ! যদি কেউ দেয় খোঁজ রেখো। করব।

—গনপতিবাবু বিয়ে করেছেন ?

সিন্ধু হেসে বলে—গনপতি নয়, গনপত। আমি ওকে গনফট বলে ডাকি। যে কাজে হাত দেয় সে কাজ হয়ে যায় গন্ অ্যাণ্ড ফট্।

—মানে ?

—মানে কাজটা বিলা হয়ে যায়। ফ্লপ্ করে।

কমলা হাসে—বুঝেছি।

গনপত লজ্জা পেয়ে মাথা নামায়, বলে—ওর কথা !

—বিয়ে করেছিস কিনা বৌদিকে বল। সিন্ধু ওকে কনুইয়ে ঠেলা দেয়। গনপত হাসে। সিন্ধু বলে—করেছে, বুঝলে বৌ' তোমার খাটনি বেঁচে গেল। মেড়ো মেয়ে খুঁজতে বিস্তর ঝাকে হত। বিয়ে করে বেঁচে গেছে ব্যাটা, নইলে ওর বাবা ওকে জুতো-পেটা করে বাড়ির বার করে দিয়েছিল প্রায়। ঘরে বৌ আছে বলে একেবারে বার করতে পারেনি।

—ওমা, কেন ?

—বাবু একসময়ে কলকাতায় কালচারাল মুভমেণ্ট করত যে ! নাটকের দলকে ফিনান্স করত। এখনো গোছা গোছা কাগজ খরচ করে নাটক লেখে। অখাদ্য সব লেখা।

—না বৌদি, ওসব কথা বিশ্বাস করবেন না। আমি সিন্ধুর

কাছে ব্যবসা শিখি।

কমলা মুখে আঁচল তুলে হেসে ফেলে—ওর কাছে শেখেন? ও ব্যবসার কী জানে?

গনপত মুখখানা করুণ করে বলে—কী করব! আমার বাপ-জ্যাঠা-খুড়ো আমাকে ব্যবসায় নেয় না যে। তাই সিন্ধুর সঙ্গে ভিড়ে পড়েছি।

লুচির টাল শেষ করে খাওয়ার টেবিল ছেড়ে উঠতে উঠতে সিন্ধু বলে—গনফট, কলকাতায় যাবি তো তুই একা যা। আমি নড়তে পারছি না।

গনপত বলে—কে যাবে বাবা! এখন আমি ছাদে গিয়ে চিৎপাত হয়ে ভুঁড়ি ভাসিয়ে শুয়ে থাকব। কলকাতা তো পালাচ্ছে না। বরং তোর যদি হার্ডশিপের ইচ্ছে থাকে তো তুই যা।

—হার্ডশিপ নিয়ে ঠাট্টা নয় গনফট। টাকা থাক বা না থাক হার্ডশিপ থাকলে ব্যবসা থাকবে। আমার ব্যবসায় মূলধন হল ক্লেশসুখপ্রিয়তা, হার্ডশিপ।

—কি বলছিস রে সিন্ধু! কি প্রিয়তা? কমলা জিজ্ঞেস করে।

গনপত উত্তর দেয়—ওর কথা বাদ দেন বৌদি। যেখানে কষ্ট আর দরকার নেই, সেখানেও খামোকা কষ্ট করবে। বালী স্টেশন থেকে এই এক মাইল রাস্তা ও স্যুটকেস হাতে হেঁটে আসতে চেয়েছিল। ব্যাটা হাড়কেপ্পনও বটে। খাবে না, গাড়ি চড়বে না, পোশাক পরবে না, কেবল কষ্ট করতে করতে দেখুন, ওর শরীরের রক্ত সব জল হয়ে গেছে। ফ্যাকাশে চেহারা। আমি বলি—মরবি সিন্ধু, খা খুব করে মাংস ভাত পরোটা। খায় না। হাসে।

—বটে সিন্ধু! কমলা চোখ কপালে তোলে—এত কৃপণ তুই ছিলি না তো!

—ও ব্যাটা বাড়িয়ে বলছে। অতটা না। তবে একটু বুঝে সমঝে চলি। বাড়ির অবস্থা বোঝই তো। একা আমার ওপর সব।

কথাটা বলেই সিন্ধু মুখটা লুকোবার জন্য ঘুরিয়ে নেয়। কথাটা বেরিয়ে গেছে, সে বলতে চায়নি। অন্ততঃ তার দাদার প্রতি কোনে ঠেস্ দেওয়ার কথা সে কল্পনাও করেনি। তবু বেরিয়ে গেছে।

সিন্ধু লম্বা তুই পদক্ষেপে বাথরুমে ঢুকে যায়।

কমলা একটা শ্বাস ফেলে রান্নাঘরে চলে আসে। পড়ার ঘর থেকে তার দুই ছেলেমেয়ের পড়ার শব্দ আসছে। পুকুরের আঁশটে গন্ধ নিয়ে বয়ে যায় একঝলক বাতাস। গরুটা গোয়ালে পা দাপিয়ে মশা তাড়াচ্ছে। খোয়া-ওঠা রাস্তায় ঝপাৎ করে লাফিয়ে ওঠে সাইকেল, তার শব্দ পায়। চুপ করে বসে থাকে কমলা। মাসে মাসে সাগর মোটে পঞ্চাশটা টাকা পাঠায় বাবার নামে। কমলার শ্বশুর-শাশুড়ী কখনো টাকার কথা লেখেন না। না লিখলেই কী ! তাঁদের অবস্থা সাগর বা কমলার অজানা নয়। একা সিন্ধুর ভরসায় তাঁরা সংসার চালান, শ্বশুরের পেনসন কিছু পাওয়া যায়, আর ব্যাঙ্কে রাখা মোটে কয়েক হাজার প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা। তা সেই টাকাও সিন্ধুর ব্যবসাতে মাঝে মাঝে তুলে দিতে হয়। সাগর সবই জানে তবু সব ভুলে থাকে। কমলার বুকটা একটু দুরদুর করে। যদি সিন্ধু শিলিগুড়িতে গিয়ে সব বলে দেয় ! তার দাদার বাড়িতে কেমন মোজাইক করা ঘর, ঘরে বাগান, দু হাজার টাকা দামের খাট ! বড় লজ্জার কথা হবে সেটা।

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক ছিল কমলা। চা করে পুনিকে ডেকে পড়ার ঘরে মাস্টার মশাইকে চা পাঠাল। হপ্তা বাজার থেকে বিকেলে বড় মাছ আনিয়েছে। কুটতে বসল। মনটা বুকটা থম্ ধরে আছে।

দরজার কাছ থেকে সিন্ধু ডাকল—বৌদি !

কমলা একটু চমকায়, হাসিমুখে বলে—আয়। একটা চেয়ার টেনে বোস।

সিন্ধু খাওয়ার ঘর থেকে চেয়ার টেনে রান্নাঘরের চৌকাট ঘেঁষে বসে।

—বৌদি, তোমার সামনে সিগারেট খাবো ?

-- খা। কতদিন তো বলেছি খেতে। এখন তো আর ছোটটি নোস।

সিন্ধু চওড়া করে লজ্জার হাসি হেসে সিগারেট ধরায়। তারপর বলে ছাদে গিয়ে শুতে না শুতেই গনকটটা ঘুমিয়ে পড়ল। একা লাগছিল বলে নেমে এলাম।

- বেশ করেছিস। শিলিগুড়ির কথা সব বল, শুনি।

—কী আর শুনবে! বাবার প্রেসার কমে বাড়ে। বাঁ চোখটা কাটাতে হবে ডিসেম্বরে! মার বড্ড খাটুনি বেড়ে গেছে, আজকাল বিয়ের জন্য জ্বালায়।

—মন্তির ক'মাস চলছে ?

—কে জানে ওসব! শুনেছিলাম তো সাত মাস।

—নন্দদের যে ভাইটা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে তার খবর পাওয়া গেল ?

—না। আজকাল যে সংসার ছেড়ে পালায় সে-ই সুখে থাকে। বলে হাসল সিন্ধু।

—শরীরটা একদম শেষ করেছিস। আমার কাছে কদিন থাক, ভাল করে খাওয়াই তোকে। এমন ফ্যাকাশে লাগে কেন চেহারাটা ?

সিন্ধু চুপ করে থাকে, সিগারেট খায়। তারপর বলে—জিয়াডিয়া।

—চিকিৎসা করাস না ?

—করাই মাঝে মাঝে।

-- মাঝে মাঝে কী রে ? জিয়াডিয়া সহজে সারে না জানিস ?

—জানি। তার ওপর জণ্ডিসের মতোও হয়েছিল।

—কৈ, জানাসনি তো! বাবাও তো লেখেনি।

—কাউকে জানাইনি। কিছুদিন লুকিয়ে ওষুধপত্র খেলাম, মা ঝাল-তেল ছাড়া রান্না করে দিত। জানিয়ে লাভ কী, বুড়োবুড়ী ভেবে মরবে। আমি এখন তাদের অন্ধের নড়ি। কাছছাড়া করতেই চায় না। কিছু হলে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

—পড়বেই তো। তুই কাছে-থাকা কোলপোঁছা ছেলে। তোর দাদা তো কবে তাদের পর করে দিয়েছে!

সিন্ধু ব্যস্ত হয়ে বলে—না না, সে কথা বলিনি।

কমলা ফিরে অকপট চোখে সিন্ধুর দিকে চেয়ে বলে—তুই বলিসনি, আমিই বলছি। কথাটা একটুও মিথ্যে নয়।

—দাদা তো বরাবরই কাছ-ছাড়া। পড়াশুনার জন্য ছেলেবেলা থেকে হস্টেলে থাকত, তারপর চাকরি করতে কলকাতায় এল। দাদার ওপর তার জন্যে কারো রাগ নেই। শুধু মা-বাবা দুঃখ করে স্কুলের বন্ধের সময়ে বাড়ি যায় না বলে। আমি তাদের বোঝাই, স্কুলের চাকরিটা দাদার কিছু না, ব্যবসাটাই আসল। ব্যবসাতে তো ছুটি নেই, তাই আসে না।

কমলা সহসা উত্তর দেয় না। তার চোখের পাতা হঠাৎ ভিজে আসে। বঁটির ওপর মাথা নিচু করে থাকে সে।

সিন্ধু একটা হাই তুলে বলে—দাদা কাছে না থাকায় আমারই যা একটু বিপদ। গত বছর মাদ্রাজে একটা চাকরি পেয়েছিলাম। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আসার পর বুড়োবুড়ী আর রাতে ঘুমোতে পারে না। সারাদিন তাদের মুখ শুকনো। কয়েকদিনে চোখের কোল বসে, চামড়া শুকিয়ে কেমন হয়ে যেতে লাগল। মুখে বলত—যাক সিন্ধু চাকরি পেয়েছে, একটা দুশ্চিন্তা কাটল। আমি মনে মনে হাসতাম। দুশ্চিন্তা কাটল না বাড়ল সে আমি ছাড়া ভাল আর কে জানে! বুড়োবুড়ীর জন্যই শেষ পর্যন্ত নিলাম না চাকরিটা। কোনোখানে যাওয়ার উপায় নেই ওদের ছেড়ে। দাদা কাছে থাকলে এরকমটা হতে পারত না।

কমলা স্খলিত গলায় বলে—এখানে এসেও তো ওঁরা থাকবেন না!

—তাই থাকে! তাহলে লঙ্কাগাছের গোড়ায় জল দেবে কে? কাঁঠাল পেঁপে কলা পাহারা দেবে কে? এক ডাঁই দামী বাসনপত্র যদি চুরি হয়? বাড়িটায় যদি আগাছা জন্মায়? বুড়োবুড়ীর অনেক সমস্যা বৌদি। বাড়ির বড় মায়া। নিজেও তো বোঝো। নইলে

আমি তো কতবার বলি—দাদার কাছে গিয়ে পার্মানেন্ট লি থাকো, আমাকে ছেড়ে দাও। শোনে না। বলে—তোর কাজে তুই যা না, আমরা একলা থাকবো।

—তা বলে নিজের ভবিষ্যৎ ভাববি না সিন্ধু ?

—ভাবা ছেড়ে দিয়েছি। নিজেকে এখন মা-বাপের বিধবা মেয়ে ভাবি।

—ব্যবসা কেমন চলছে তোর ?

—নর্থ বেঙ্গলে ব্যবসা আর চলে ? প্রথম প্রথম কিছু কনস্ট্রাকশনের কাজ হয়েছিল। সেই গন্ধে হাজারটা কণ্ট্রাক্টর কলকাতা থেকে গিয়ে মাছির মতো পড়ল সেখানে। তাদের জন্য নতুন নতুন হোটেল খুলল শিলিগুড়িতে, মদের বার বসল, বাঙালী অবাঙালী ব্যবসাদার আর ফড়ে এখনো থিক থিক করছে শহরে। জোর কম্পিটিশন। পঁচিশ-ত্রিশ পারসেণ্ট লেস দিয়ে সবাই টেণ্ডার ধরছে। আমাদের সেই ক্ষমতা কোথায় ? বেকার ইঞ্জিনীয়াররা একটা অ্যাসোসিয়েশন করে কণ্ট্রাক্ট নিচ্ছিলাম, কিন্তু জয়েণ্ট কোম্পানী চালানোর মতো মাথা আমাদের নয়। ঝগড়াঝাঁটি করে সব আলাদা হয়ে গেল। যে লোকটা আমাদের কণ্ট্রাক্ট ধরে দিত সে কণ্ট্রাক্টের জন্য মোটা কমিশন নিত, এইসব কারণে ঝগড়া। ইলেকট্রিক সাপ্লাই আর ইউনিভার্সিটি যা টুকটাক কাজ দেয় তাইতে এখন চালিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু আসলে চলে না। যা খাটি সে তুলনায় কিছু পাই না।

কমলা অন্যমনস্ক গলায় বলে—কত ছেলেই তো বাইরে চাকরি করতে যায়, তাদের মা-বাবা একা থাকে না ? আমার শ্বশুর-শাশুড়ীই কেন পারবেন না ?

সিন্ধু সিগারেটটা চটির নীচে ঘষে নেভায়। বলে—ঠিক কথা। এ কথাটা মা-বাবাকে একবার গিয়ে বুঝিয়ে এসো। তাহলে আমি বেঁচে যাই। অবশ্য মা-বাবা রাজী হলেই যে চাকরি পাবো তাও নয়। মাদ্রাজেরটা হঠাৎ পেয়ে গিয়েছিলাম কপালজোরে। আর কি সেরকম হবে ? তবু যদি বোঝাতে পারো বা নিজেদের কাছে

এনে রাখতে পারো তাহলে বড় ভাল হয়। নইলে বুড়োবুড়ী না মরা পর্যন্ত বুঝলে —আমি খালাস হচ্ছি না।

বলে সিন্ধু একটু থমকে গেল, বলল—কথাটা খুব ক্রুয়েল হয়ে গেল বৌদি, মাঝে মাঝে ফ্রাস্ট্রেশন থেকে বলে ফেলি। নইলে আমি কিন্তু জান দিয়ে বুড়োবুড়ীকে ভালবাসি।

—জানি সিন্ধু। কমলা দীর্ঘ একটি শ্বাস ফেলে।

—বৌদি, তোমার তেল পুড়ে গেল, মাছ ছাড়ো!

কমলা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি রান্না চাপাল।

সিন্ধু হেসে বলে—যতই চেষ্টা করো, মা-বাবাকে পার্মানেণ্ট্‌লি আনতে পারবে না তোমাদের কাছে। বৃথা চেষ্টা। ওরা দশ-পনেরো দিন কি জোর মাসখানেকের জন্য আসবে, তারপর ঠিক শিলিগুড়িতে ফিরে যাবে। বুড়ো মনে করে ওটাই এখন তার দেশ, তার বাড়ি। নিজের টাকার বাড়ি কী রকম জানো তো!

কমলা ম্লান হাসল। বলল—জানি।

সিন্ধু বলে—কেবল আমারই জানা হবে না।

—কেন রে?

—নিজের টাকায় বাড়ি! ভাবতে পারি না।

—তোর আর বাড়ি দিয়ে কী হবে? শ্বশুরমশাইয়েরটাই তুই নিস!

সিন্ধু হাসে—সেটা তো বাবার টাকায় বাড়ি।

—তাতে কী রে হাঁদারাম? বাবা কি তোর পর?

সিন্ধু একটু চুপ করে থেকে বলে—বাবা আমি নই। তফাৎ থাকেই। এগুলো পুরুষমানুষদের ফিলিং, বিশেষতঃ ফ্রাস্ট্রেটেড পুরুষদের। তুমি বুঝবে না।

বলে সিন্ধু সিগারেট ধরায়।

কমলা একটু দেখে বলে—এত সিগারেট খাস কেন রে? তোর না জিয়াডিয়া, জণ্ডিস্?

—টেনশনের জন্য খাই। সব সময়ে এত চিন্তা আর উদ্বেগ

থাকলে একটা নেশা দরকার। তাই বেশী খেয়ে খেয়ে অভ্যেস গেছে। খেলে টেনশন কমে যায়।

—টেনশন তো কমে কিন্তু ব্যামো বাড়বে না? আর ঐ কড়া সিগারেট, ওগুলো মানুষে খায়? তোর দাদাকে বকে-ঝকে ঐ হলদে প্যাকেটের বিচ্ছিরি গন্ধের সিগারেট ছাড়িয়েছি। ওগুলো খাস কেন?

—সস্তা।

—পেটে আলসার-টালসার হবে শেষে দেখিস।

—হলে হবে। মানুষ এখন চায় ইমিডিয়েট রিলিফ। মাথা ধরেছে তো অ্যাসপ্রো বা অ্যানাসিন খেয়ে নাও, অম্বল হলেই অ্যালুড্রক্স, জ্বর হলেই নোভালজিন। মানুষ একদম অসুখ-বিসুখ ব্যথা-বেদনাকে সময় দিতে চায় না, সময় নেই, তেমনি টেনশন হলেই সিগারেট। পরে কী হবে না হবে তা নিয়ে মানুষ একদম ভাবা ছেড়ে দিয়েছে।

—তাহলে কিন্তু সিগারেট খাওয়ার যে অনুমতি দিয়েছি তা ফিরিয়ে নেবো!

সিন্ধু একটু হাসল।

পড়ার ঘর থেকে দুদ্দাড় দৌড়ে আসে জয়া আর সৈকত। 'কাকা কাকা' বলে ঘিরে ধরে সিন্ধুকে। তাদের শরীরের সুঘ্রাণ বুকে টেনে নেয় সিন্ধু। শৈশবের গন্ধ কী সুন্দর, রোদবাতাসের গন্ধের মতো শুদ্ধ।

—ঐ যাঃ বৌদি! সিন্ধু বলে—মা ওদের জন্য কী সব তৈরী করে স্যুটকেসে দিয়ে দিয়েছে দিতে ভুলে গেছি।

সিন্ধু উঠে গিয়ে কৌটো বের করে আনে। নাড়ু, তক্তি, ক্ষীরের ছাঁচ, গোকুলপিঠে নিয়ে ওরা হৈ হৈ করতে থাকে। সিন্ধু এসে আবার রান্নাঘরের দরজায় বসে।

—বৌদি, দাদা কত রাতে ফেরে?

—অনেক রাত্তে। পৌনে দশটা, দশটা, কখনো এগারো বারোও হয়।

—খুব ব্যস্ত, না ?

—খুব।

—ব্যস্ততাই ভাল, আমি হার্ডশিপে বিশ্বাস করি।

কমলা শ্বাস ফেলে। বলে—আমিও করি।

জানি, তোমরা বাড়ি-বাড়ি করে দুজনে কম কষ্ট করোনি। আমরা প্রথমে হাসাহাসি করেছি, তারপর ক্রমে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছি। দাদা যে এরকম হতে পারে তা ভাবতেই পারতাম না। হার্ডশিপ থেকেই আসে সুখ।

কমলা হঠাৎ অপলক চোখে সিন্ধুর দিকে চেয়ে থাকে। তার ফর্সা রঙে উনুনের আঁচ লেগে লালচে দেখায় মুখ। সুন্দরী না হোক কমলার শ্রী ছিল, আছে। তবে কমলার শ্রীর মধ্যে বরাবর একটু রুক্ষতা ছিল। জেদও বলা যায়। কিংবা অহংকার কি ? সিন্ধু তা সঠিক নির্ণয় করতে পারে না।

কমলা চেয়ে থেকে বলে—তুই কি ভাবিস সিন্ধু, আমি খুব সুখে আছি ?

॥ তিন ॥

ক্লাসঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে সাগর বাইরের দিকে চেয়েছিল। তিনতলায় ক্লাস, আকাশ অনেকটা দেখা যায়। শরতের কাশফুলি মেঘ ভেসে যাচ্ছে, অনেক উপরে কয়েকটা বিন্দুবৎ চিল, একটা ঘুড়ি একা অনেক উঁচুতে থম্ ধরে আছে। ঘুড়িটা হলুদ। আচমকা বাতাসের টানে একটা নীল সাদা প্রকাণ্ড বেলুন ধীরে জেগে ওঠে। হিলিয়াম বেলুন, তার সঙ্গে সুতোয় বাঁধা বিজ্ঞাপন—আর্ন মান্থ্লি ইণ্টারেস্ট ফ্রম ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া! কালো লেখাটা ঘন নীল আকাশের গায়ে স্থির হয়ে ভাসে।

ছেলেরা সাগরের দেওয়া টাস্ক করছে। করছে কি না কে জানে! কাটাকুটিও খেলতে পারে কেউ কেউ, গল্পের বই পড়তে পারে।

মোটের ওপ'র চুপ করে থাকে, গোলমাল করে না সাগরের ক্লাসে। টাস্ক্ না করলে কোনো ক্ষতি নেই। ঘণ্টা পড়ার সময় পর্যন্ত কাটিয়ে দেয় সাগর, টাস্ক্ দেখে না।

আর্ন মান্থলি ইণ্টারেস্ট্ ফ্রম ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া লেখাটার দিকে চেয়ে থাকে সাগর। হিলিয়াম বেলুনটা কত উঁচুতে উঠেছে! ঘুড়িটা সরে যাচ্ছে ডান থেকে বাঁয়ে, তারপর চমৎকার একখানা বাঁক নিয়ে গোঁত্তা খেয়ে আবার ওপরে উঠল। একটা কালো ঘুড়ি কোথা থেকে বেড়ে কাছাকাছি আসে। হলুদ ঘুড়িটা দুটো পাক খায় এগোয়। লড়বে। সাগর আবার আকাশের গায়ে লেখাটা দেখে একটা কবিতার লাইন ভেসে আসতে থাকে মনের ভিতর। স্পষ্ট নয়, কেবল গুন্ গুন্ একটা ধ্বনি তোলে মাত্র। সে উৎকর্ণ হয়ে শব্দটা শোনে—দীর্ঘ খোয়াই···তারপর ঝিরঝিরে স্বচ্ছ ঘুম নদী·· রঙীন ও ধনুকের মতো বাঁকা একখানি সাঁকো···ও পাশে স্বপ্নের বাগান·· ছন্দ নেই, একটা দোলাচল আছে শুধু। একটু শব্দের আলোড়ন মাত্র। এখনো কবিতার শরীর স্পষ্ট নয়। সময় নেবে

—স্যার!

—উঁ?

—হয়ে গেছে।

—হুঁ। বোসো।

—দেখবেন না স্যার?

—দেখবো। রেখে দাও।

ছেলেটি বসে পড়ে।

সাগর আবার উৎকর্ণ হয়। গুঞ্জনটা শুনবার চেষ্টা করে। দীর্ঘ খোয়াই···কথাটা হারিয়ে যায়। নীল আকাশের বুকে আবার একটা বাতাসের টানে উঠে আসছে লেখাটা—আর্ন মান্থলি ইণ্টারেস্ট্·· হলুদ ঘুড়িটা ভেসে যাচ্ছে ঢেউয়ের নৌকোর মতো। দীর্ঘ খোয়াই ···তারপর ঝিরঝিরে স্বচ্ছ ঘুম নদী···

আসছে না। সাগর ক্লাসঘরের দিকে চেয়ে থাকে! নামানে

সব মাথা, কালো চুল···রঙীন ও ধনুকের মতো বাঁকা একখানি সাঁকো ···ওপাশে স্বপ্নের বাগান···

ঘণ্টা বাজে। এক, দুই, তিন। সাগর দরজার দিকে ফেরে। হারিয়ে যাওয়ার আগে কটা লাইন নোটবইতে লিখে নিতে হবে। তাড়াতাড়ি।

স্যার, দেখলেন না? নাছোড় ছেলেটা উঠে দাঁড়ায়।

—পরের দিন দেখিও। সাগর বলে। ফিরে তাকায় না আর। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে।

থার্ড পিরিয়ডেই সাগরের ক্লাস শেষ হয়ে যায় রোজ। রুটিনে ঐ পর্যন্তই তার ক্লাস। গত বছর থেকে নিয়মটা চলে আসছে।

গতবারই সাগর স্কুলকে দু দফায় হাজার ছয়েক টাকা ডোনেট করেছে। আর ন' হাজার টাকা ডোনেশন তুলে দিয়েছে। একটা চ্যারিটি জলসা আর গোটা দুই ফিল্ম্ শো করেছিল। গরীব স্কুলটা খানিকটা বেঁচে গেছে। স্যালারি অ্যাকাউন্টের ছ'হাজার টাকারও সংস্থান হত না বলে একসময়ে মাস্টার মশাইরা পুরো বেতন পেতেন না, যা পেতেন তাও দু-তিন দফায়। এখন পনেরো হাজার টাকার একটা ক্যাপিট্যাল থাকায় মাস-মাইনের ভাবনা নেই। স্কুল তাকে খাতির করে। গত বছর থেকেই তার ক্লাস কমে অর্ধেক হয়ে গেছে। কেউ কিছু বলে না। টিফিনের এক পিরিয়ড আগেই সে চলে যেতে পারে।

আজ যায় না সাগর। বসে বসে লাইন কটা সাজায়। মোটে চারটে পংক্তি। বেয়ারা এসে পাশে চা রেখে যায় সসম্ভ্রমে, ডিসটার্ব করে না কেউ। লাইন কটা নিয়ে বসে থাকে সাগর। একজন মাস্টারমশাই প্রবল কাশি চাপছেন, পাছে সাগরের অসুবিধে হয়। গত মাসেও ঐ মাস্টার মশাইটি সাগরের কাছ থেকে একশ টাকা ধার নিয়েছেন। প্রায়ই নেন। প্রায় সবাই এখানে সাগরের অধমর্ণ।

সাগর লাইন ক'টার দিকে চেয়ে থাকে হতাশায়। পুরো কবিতা

নয়, ছিন্ন শরীর মাত্র। এই হচ্ছে মুশকিল। কবে যে বাকী অংশটা ধরা দেবে তার কোনো ঠিক নেই।

শুদ্ধ কবিতাগুলি নির্মিত হয়েই আছে। হয়তো অন্তরীক্ষে বা আবহমণ্ডলের কোথাও এক রহস্যময় আলো-আঁধারিতে বাস করে কবিতাগুলি। মাঝে মাঝে কদাচিৎ তারই অংশগুলি ধরা দেয়। শুধু কবিতা কখনোই কবির নিজের রচনা নয়, কবি উৎকর্ণ উন্মুখ থাকলেই মাত্র অন্তরীক্ষের ইঙ্গিতগুলি তার কাছে পাখীর মতো উড়ে আসে মাঝে মাঝে। সাগরের এরকমই ধারণা।

—সাগরবাবু, আপনার টেলিফোন! বেয়ারা এসে বলে যায়।

টেলিফোনটা হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরে। সাগর উঠে অন্যমনস্ক ভাবে বারান্দা পার হয়।

হেডমাস্টার মশাইয়ের মুখখানা ভারী আহ্লাদী। ভালমানুষী এবং নিরীহতায় মাখানো। সাগরকে দেখে হাসলেন, সম্ভ্রম ফুটে ওঠে চোখে। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা হাতে দেওয়ার সময়ে বললেন—মাণিকবাবু কথা বলছেন মনে হল।

মাণিক রোজই দু-তিন বার ফোন করে। হেড স্যার গলা চিনে গেছেন।

—কে, সাগর?

—বলছি।

—তোর .তা এখন ছুটি! একবার মজুমদারের কাছে যা।

—মজুমদার রাজী হয়েছে?

—হয়েছে।

—দশ হাজার দেবে?

—দেবে, তবে বেগরবাঁই করছে। আমরা সবসুদ্ধু ছ'জন টেণ্ডারার আছি কর্পোরেশনের ঐ অর্ডারটার জন্য। আগামী কাল লাস্ট্ ডেট্। মনে হচ্ছে আর কেউ টেণ্ডার দেবে না, যদি না দেয় তাহলে ছ'জনের মধ্যেই বন্দোবস্ত হবে।

—কী রকম বন্দোবস্ত?

—জানিসই তো, মজুমদার কী রকম উঁচু রেট দেবে!

সাগর বিরক্ত হয়ে বলে—আঃ, সেটা জানবো না কেন? আমি কি বাচ্চা ছেলে? বলছি, মজুমদার অন্য চারজনকেও দশ হাজার করে দিচ্ছে কি না।

—না, আমাদেরই দিচ্ছে, সিক্রেটলি। হাতেপায়ে ধরে বলেছে, যেন অন্য চারজনকে টাকার পরিমাণটা না জানাই।

—বাকি চারজন টেণ্ডারার কারা?

—বিশ্বাস, কৃষ্ণা কোম্পানী, লিঙ্ক এণ্টারপ্রাইজ আর চক্রবর্তী।

—মজুমদার টাকা কবে দেবে?

—কাল বেলা বারোটায়। ক্যাশ ডাউন। তুই আজ তবু একটু কথা বলে আয়। ও বলছে যদি কালকের মধ্যে নতুন কোনো টেণ্ডারার আসে তাহলে অত টাকা দেবে না। নতুন টেণ্ডারারকেও খাওয়াতে হবে তো।

সাগর একটু ভেবে বলল—তবু তুই টেণ্ডারটা টাইপ করিয়ে রাখ। মনে হয় শেষ পর্যন্ত মজুমদার কষাকষি করবে। যদি করে তো আমরা টেণ্ডার সাবমিট করব, প্যাক্টে যাবো না।

—তবে বাকী চারজনের কী হবে? আমরা যদি শেষ পর্যন্ত টেণ্ডার দিই তো ওদের বিট্রে করা হবে। তুই বরং মজুমদারকে আজ একটু বুঝে আয়।

—মজুমদারের সঙ্গে যখন প্যাক্ট তখন সবাই নিজের টেণ্ডার পকেটে নিয়েই যাবে। ভাবিস না, আজ আমি একটু ব্যস্ত।

—কী নিয়ে?

—কয়েকটা লাইন মাথায় এসেছে।

—ওঃ! কিন্তু কারখানাতেও তোর একবার যাওয়ার কথা ছিল যে। গানমেটালের বুশগুলো ডেলিভারি দেয়নি।

—তুই যা।

—আমি তো যাচ্ছিই হাওড়ায়। স্লুইস্ গেটের প্লেট আজ বেণ্ডিং হবে, ভুলে গেছিস?

সাগর একটা শ্বাস ফেলল, সেই শ্বাসটা বোধহয় শুনতে পেল মাণিক। হাসল, বলল—আচ্ছা যা, আজ তোকে ছুটি দিচ্ছি ; কিন্তু কাল সকালে স্কুলে আসার সময়ে কারখানাটা ঘুরে আসিস। ওদের বড্ড লেবার ট্রাব্‌ল্‌। গোলমাল হলে আমাদের কন্‌স্ট্রাকশন পিছিয়ে যাবে। একটা কথা বলি সাগর, স্কুলটা এবার ছাড়।

সাগর ফোনটা কান থেকে সরিয়ে রিসিভারটার দিকে একটু চেয়ে থাকে। কালো টেলিফোনটা থেকে এখনো মাণিকের কথা ভেসে আসছে—বুঝলি, বারো লাখ টাকার কাজ, তিন লাখ খাওয়াতে হবে, ওরা বলছে বারো লাখের বিল করবেন, আমরা ছয় কেটে নেবো। অর্ডারটা নেওয়া কি ঠিক হবে ?

পুরো কথাটা শোনেনি সাগর। তবু তার অসুবিধে হয় না বুঝতে। অভ্যেস হয়ে গেছে। কোনো সরকারী ডিপার্ট্‌মেন্ট থেকে ফাঁকিবাজির কণ্ট্রাক্ট দিচ্ছে। বিনা কাজে টাকা। ফোনটা কানে ধরে বলে—পাগল! ছয় লাখ টাকা খরচ দেখাবি কি করে? ছেড়ে দে।

—যদি স্টাফ বাড়াই ? এস্টাব্লিশমেণ্টের খরচ দেখাই ?

—দূর বুদ্ধু! অত টাকা ঢোকানো যাবে না। দম্‌-সম হয়ে যাবি। ছেড়ে দে।

—ঠিক আছে, তোর কি গাড়ি দরকার ? বল্‌ তো স্কুলে পাঠাই ?

—না। তুই হাওড়ায় যা।

—আমি আচাযির গাড়িতে যাচ্ছি।

—আমার দরকার নেই।

—আচ্ছা। ছেড়ে দিচ্ছি—

মাণিক ছেড়ে দিল।

স্টাফরুমে এসে সাগর তার নোটবইটা খুলল। দীর্ঘ খোয়াই··· তারপর ঝিরঝিরে স্বচ্ছ ঘুম ···নদী রঙীন ও ধনুকের মতো বাঁকা একখানি সাঁকো·· ওপাশে স্বপ্নের বাগান । অর্থহীন লাগল লাইনকটা কিছুক্ষণ। মজুমদার কাল ডাউন-পেমেণ্ট করবে কি না সন্দেহ হতে থাকে সাগরের। হয়তো আরো দু-একজনকে জুটিয়ে এনে শো

দেবে। বলবে—দেখুন, এরাও আজ টেণ্ডার দিতে এসেছে। কী করি? ক্যাশ এত টাকা দিচ্ছি, আপনারা ভাগ করে নিন। নতুন লোকগুলো হয়তো মজুমদারেরই ভাইপো ভাগ্নে কেউ হবে। ভাগের টাকা নিয়ে মজুমদারের বাড়িতেই তুলে দিয়ে আসবে।

নোটবইটা খুলে বসেই রইল সাগর। কলমের মুখটা শুকিয়ে গেল। বুশগুলো এখনো দেয়নি, ইরেকশনটা যদি পিছিয়ে যায়! অনেক চিন্তা। তবু আরো কিছুক্ষণ সাগর হতাশভাবে একটা রঙীন সাঁকোর দিকে চেয়ে রইল। 'বাগান' শব্দটা বড় বেমানান বাজে শব্দ। সেটা বদলে একবার লিখলো 'দেশ'। আবার কাটল। পরের লাইনগুলো আর আসছে না। কিন্তু সাগর স্পষ্টই অনুভব করে অন্তরীক্ষে রহস্যময়তায় অস্পষ্ট হয়ে আছে তারা। নৃত্যপর কয়েকটি পংক্তি। আসছে না।

আবার ফোন আসে।

—ভট্টাচার্য বলছি।

—কোন্ ভট্চায্?

—সমীর।

—ও।

—আপনি আমাকে একটা অ্যাপার্ট্‌মেন্টের জন্য বলেছিলেন মনে আছে?

—হ্যাঁ।

—একটা পেয়েছি। আলিপুরে। সত্তর হাজার।

—ডাউন পেমেণ্ট কত?

—আটাশ হাজার। মাসিক কিস্তি তিনশ সত্তর।

—ঠিক আছে। কিন্তু বাড়িটা কত উঁচু?

—দশতলা। আপনার ক'তলায় চাই? গ্রাউণ্ড ফ্লোরটা কেবল গ্যারেজ, ফার্স্ট ফ্লোর থেকে পাবেন।

—আমি দশতলায় চাই।

ভট্চায চুপ করে থাকে, বলে—দশতলায়?

—হ্যাঁ। আরো উঁচুতে হলে আরো ভাল হত।

—ভট্‌চায হাসে। বলে—দশতলায় পাবেন। অত ওপরে ডিম্যাণ্ড কম। যদি বাইচান্স লিফ্‌ট কোনোদিন গড়বড় করে তবেই কিন্তু মুশকিল!

—হোক্‌। আমি দশতলায় চাই। পজেশন কবে থেকে দেবে?

—দেরি আছে। আণ্ডার কনস্ট্রাকশন। জানাবো।

ফোন রেখে দেয় সাগর।

স্টাফরুমে বসে সে কিছুক্ষণ এক অগাধ ক্লান্তি বোধ করে। চোখ বুজে থাকে। শুনতে পায়, বাইরে কারা তার খোঁজ করছে। বেয়ারাটা বলল,— বিশ্রাম নিচ্ছেন, একটু ঘুরে আসুন।

—আমরা কালও এসে ফিরে গেছি।

সাগর চোখ খুলে বলল—কে রে ভানু? পাঠিয়ে দে।

তিনটি অল্পবয়সী ছেলে এসে দরজায় দাঁড়ায়।

—সাগরশঙ্কর চ্যাটার্জী—?

—আমিই। কী চাই?

ছেলে কটা চটপট পায়ে এগিয়ে আসে। একটা চটি পত্রিকা সাগরের সামনে টেবিলে রেখে বলে—কাগজটা দিতে এসেছি।

কাগজের নাম 'কল্পনালতা'। কবিতার কাগজ। প্রচ্ছদে চমৎকার একখানা স্কেচ। প্রাণবন্ত একটি মেয়ের মুখ। ছবিটা চেনা-চেনা লাগে সাগরের। কোথাও এর আগে দেখেছে।

—প্রচ্ছদ কার আঁকা?

তিনজনের একজন এগিয়ে বলে—আমার। কেমন হয়েছে?

সাগর ছেলেটার রুক্ষ মুখখানার দিকে তাকায়। কী বলবে সাগর! হুবহু এরকম একটা স্কেচ সাগর দেখেছিল। পিকাসোর আঁকা। ভাবল ছেলেটাকে একটু ধমকে দেবে। দিল না। এখন আর শুদ্ধতা কার ভিতরে আছে! বলল—ভালই।

একজন বিনীতভাবে বলে—আপনার কাছে একটা কবিতার জন্য এসেছিলাম। নেক্‌সট ইস্যু ডিসেম্বরে বেরোবে—

—কবিতা ! বলে সাগর একটু চেয়ে থাকে ছেলেগুলোর দিকে। তার বুকে অজান্তে জমে যায় শ্বাস। আস্তে সেই শ্বাসটুকু অনেকক্ষণ ধরে ছাড়ে সাগর। বুকটা হঠাৎ খালি-খালি লাগে। সাগর বলে —আমি তো ভাই এখন আর লিখি না।

—কেন লেখেন না ? আর্টিস্ট ছেলেটা জিজ্ঞেস করে।

—পারি না। হয় না। বলে সাগর অন্যমনস্কভাবে টেবিলের ওপর রাখা নিজের দুখানা হাতের দিকে চেয়ে থাকে। ছেলেগুলোর মুখের দিকে না তাকিয়েই বলে—আমার শেষ কবিতা ছাপা হয়েছিল বছর দুয়েক আগে, তারপর আর বেরোয়নি। আপনারা আমার খোঁজ পেলেন কোথায় ?

তৃতীয় ছেলেটি কথা বলেনি এতক্ষণ, এবার সে বলে—আপনার নাম অনেকের মুখে শুনি। একটা সংকলনে পড়েওছি আপনার কবিতা।

তীব্র সন্দেহে সাগর ছেলেটির দিকে তাকায়। একবার ভাবে ছেলেটা মিথ্যে কথা বলছে! ওকে দু-একটা লাইন বলতে বলবে নাকি সাগর ! তার মুখটাতে তীব্র বিদ্রূপ ঝল্‌সায়। কিন্তু সামলে গেল। নিস্পৃহ গলায় বলে—কবিতার কথা থাক। আমি লিখতে পারছি না। আর কিছু দরকার আছে ?

যে প্রথম কবিতা চেয়েছিল সেই ছেলেটি বিনীত ভাবে বলে—একটা বিজ্ঞাপন যদি দিতেন ! জানেন তো লিটল্ ম্যাগাজিন কি ভাবে চলে !

সাগর ছেলেটার মুখ থেকে সাদা দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় চট্ করে। এটা সে জানত। বহু লিট্‌ল্ ম্যাগ্যাজিনকে সে এখনো মায়াবশে বিজ্ঞাপন যোগাড় করে দেয়। স্মিতমুখে নিজের আঙুলগুলির দিকে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলে—বিজ্ঞাপন পাবেন। যদিও আমার কোম্পানী ছোট, আর পাবলিসিটির জন্য আমরা কিছু খরচা করি না, তবু দেবো। একদিন আমার ধর্মতলার অফিসে যাবেন সন্ধ্যের পর।

—ব্যাক কভারটা রেখে দেবো ?

সাগর উদাসীন ভাবে বলল—রাখবেন।

—কবিতা না দিলে কিন্তু ছাড়ছি না। সেই ছেলেটা বলে। তারপর তারা তিনজন পিছোতে থাকে, বলে—চলি তাহলে!

—আসুন ভাই।

ক্লান্ত সাগর চোখ বুজে থাকে একটুক্ষণ। কবিতা কথাটাই কি মদের মতো ? বিদ্যুৎ-চমকের মত ও কথাটা যতবার শোনে ততবার সে শিহরিত হয়। হতাশ হয়। উত্তেজিত হয়। নেশার ঘোরে এক অপার্থিব আলো-আঁধারি জগতের দিকে মনে মনে চেয়ে থাকে।

টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই ছেলেদের দৌড়পায়ের আওয়াজ আর হোঃ হোঃ চিৎকার শোনা যায়। স্টাফরুমে ভিড় বেড়ে যাবে। সাগর উঠল।

দুপুরের আকাশে বাতাসের টানে হিলিয়াম বেলুনটা হেলে আছে। আর্ন মান্থলি ইন্টারেস্ট—লেখাটা শূন্যে শুয়ে আছে। ভেঙে পড়েছে দুপুরের রোদ কলকাতায়। সাগর কিছুদূর হাঁটল, তারপর ট্রামে উঠল। আজকের দুপুরটা মাণিক তাকে ছুটি দিয়েছে। কিন্তু আসলে সাগরের ছুটি নেই। একবার মজুমদারের কাছে যাওয়া খুবই দরকার। শেষ মুহূর্তে লোকটা বেগরবাঁই করতে পারে।

ম্যাঙ্গো লেনে কী করে যে মজুমদার অফিস খুলেছে সেটাই অবাক লাগে সাগরের। ধর্মতলায় সাগরের অফিসটা ছোট্ট আর ঘিঞ্জি। একটা বড় ঘরে তিনটে টিক প্লাইয়ের পার্টিশন দিয়ে তিন-খানা অফিস ঘর, তারই একটা বহু কাঠখড় পুড়িয়ে যোগাড় করেছে সাগর আর মাণিক। সেখানে তিন-চারজনের বেশী লোক এলে ঠাসাঠাসি হয়। কিন্তু অফিসটা বড় কথা নয় বলে এবং তাদের দুজনেরই বাইরে বাইরে ঘোরার কাজ বলে তারা অফিস নিয়ে বেশী মাথা ঘামায়নি।

কিন্তু মজুমদার মাথা ঘামিয়েছে। ঢুকতেই অফিসের ছোট্ট কিন্তু

বাহারী রিসেপ্‌শন্‌ রুম। তুটো ডানলোপিলোর কৌচ আছে, মেঝেতে দড়ির কার্পেট। দেয়ালে লাগানো শীতলপাটির ওপর পটুয়াদের হাতের কাজ। চমৎকার একখানা কাঠের কাউণ্টারের মতো, তার ওপাশে চলনসই চেহারার রিসেপ্‌শনিস্ট্‌ মদিরা দত্ত। মদিরার আসল নাম ছিল মন্দিরা, মজুমদার 'ন'টুকু ছেঁটে নিয়ে নামটাকে একটু 'হট্‌' করে নিয়েছে। মন্দিরার পিছনে ঘষা কাচ লাগানো পার্টিশন, স্প্রিং লাগানো ফ্লাশডোর। ওটা মজুমদারের ঘর, মদিরাকে পার না হয়ে মজুমদারের ঘরে ঢোকা যায় না। পার হওয়াটা বেশ শক্ত।

সাগরের মাথার ভিতরে তখনো খোয়াইয়ের শেষে ঝিরঝিরে নদীটি এবং তার ওপর রঙীন সাঁকোর দৃশ্যটা আবছা লেগে আছে, সে মজুমদারের রিসেপ্‌শনে ঢুকে মদিরাকে লক্ষ্য না করে মজুমদারের ঘরে ঢুকে পড়তে যাচ্ছিল।

মদিরা মিষ্টি হেসে বলল—নেই।

সাগর তার লম্বা চুলগুলোর ওপর অন্যমনস্ক হাত বোলাতে বোলাতে মদিরার দিকে চাইল। বাক্সম্‌ যাকে বলে মদিরা ঠিক তাই। একটু ভারী চেহারা, চৌকো থুঁতনি, রঙটা খারাপ নয়। ঠোঁট অতিরিক্ত পাতলা বলে মুখ বুজে থাকলে হঠাৎ মনে হয় ওর ঠোঁট বলে কিছু নেই। ঠোঁট না থাক লিপস্টিক আছে ঠিকই, তাতে এইটুকু সুবিধে হয়েছে যে ঠোঁটের অবস্থান বোঝা যায়। চোখ দুটো বোধহয় একটু গোল ধরনের, তাতে ম্যাস্‌কারা, কাজল, রঙ দিয়ে দিব্যি বড় আর টানা করে ফেলেছে। ডোনারে বাঁধা খোঁপা। পরনে বম্বে ডাইংয়ের চমৎকার ছাপা শাড়ি, হাতে পুরুষদের ঘড়ি। সামনে একটা টাইপরাইটার আর টেলিফোন। বস্তুতঃ কোনো কাজ নেই বলে সারাদিন হাই তোলে, ঝিমোয় আর ভাবে মদিরা। মজুমদারের সঙ্গে লাঞ্চে যায় মাঝে মাঝে। মজুমদারের কাছে তুরকম পার্টি আসে, দেনেওয়ালা আর লেনেওয়ালা। একদল মজুমদারকে বিজনেস্‌ দেয়, অন্যদল মজুমদারের কাছে পেমেণ্ট নেয়। এই দুটো

দলকে খুব সতর্কতার সঙ্গে চিনে নিয়েছে মদিরা। সাগর লেনেওয়ালা। কাজেই নেই কথাটাকে বিশ্বাস করবে কিনা ভাবতে ভাবতে জিজ্ঞেস করল—কোথায় গেছে?

মদিরা মিষ্টি হেসে বলে—ইন্‌কাম ট্যাক্সের হিয়ারিং আছে। বসুন না, এসে যাবে।

সাগর কৌচে বসে পড়ল। বলল—চা হবে মদিরা?

—বাঃ, নিশ্চয়ই। কলিং বেলটা টিপতেই এক ঝাঁক মিষ্টি ঘুঙুরের শব্দ হল।

সাগর বলে—মজুমদার কলিং বেলটা পর্যন্ত পয়সা খরচ করে করেছে! না মদিরা?

মদিরা হাসে। হাসাটাই কাজ তার। বেয়ারা কোথা থেকে এল কে জানে। ভুঁইফোড়ের মতো সামনে এসে দাঁড়াল মুশ্‌কো একটা সাদা জিন-এর ইউনিফর্ম-পরা লোক। সে চায়ের অর্ডার নিয়ে চলে গেল।

সাগর মদিরার দিকে স্থিরচোখে তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরাল, বলল—অফিসের ডেকরেশনের জন্য মজুমদার এত মাথা ঘামায় কেন বলুন তো?

—অনেকে ডেকরেশন পছন্দ করে।

সাগর মাথা নেড়ে বলল—আমরা যে দরের কন্ট্রাক্টর মজুমদারও সেই দরের। খুব বড় কন্ট্রাক্টরের কথা ছেড়ে দিন, আমাদের মতো লোকের একটা ঠিকানা আর একটা টেলিফোন নম্বর হলেই হল। ফর করেসপণ্ডেন্স অ্যাণ্ড কমিউনিকেশন, ব্যাস্। যদি কাউকে কখনো এণ্টারটেন করতেই হয় তো তার জন্য হোটেল রেস্টুরেণ্ট বার আছে, কিন্তু তবু মজুমদার না হোক হাজার দশেক টাকা ঢেলেছে ডেকরেশনের জন্য। আপনিও অফিস ডেকর মদিরা।

মদিরা তার অদৃশ্য ঠোঁট বিস্তৃত করে হাসে। দাঁতগুলো একটু হলদেটে হলেও বেশ মজবুত, আখের গোড়া কিংবা খাসীর ঠ্যাং চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেলতে পারবে। চোয়ালও বেশ জোরালো।

তবু হাসিটা দেখল সাগর। ঐ হাসির আড়ালে মদিরার মনোভাব বুঝবে এমন সাধ্যি কার আছে! মদিরা সাগরের চোখ থেকে লজ্জার ভান করে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল—মেয়েরা তো তাই!

—কী?

—সব জায়গাতেই মেয়েরা ডেকরেশন! ঐভাবেই তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে।

সাগরের একবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল—মজুমদার আঁপনাকে কী ভাবে ব্যবহার করে? শুধু মাত্র ডেকরেশন! এক বছর আগে মজুমদার তার বৌকে ডিভোর্স করেছে, তারপর আর বিয়েও করেনি, এই সিচুয়েশনে আপনাকে কি কেবলমাত্র অফিসে সাজিয়ে রেখেছে মজুমদার বাঁকুড়ার ঘোড়া বা কেষ্টনগরের পুতুলের মতো? ব্যবহার করেনি?

—আপনাদের বিজনেস্ তো দারুণ চলছে, মিস্টার মজুমদারের কাছে শুনি আপনারই এখন রোরিং! মদিরা তার মুখখানা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে পাশ কেটে তেরছা চোখে সাগরের দিকে চেয়ে বলে।

—ঐ একরকম।

মদিরা হাসিটা বজায় রেখেই বলল—আপনারা সি. এম. ডি. এ-র অর্ডারটা বড্ড কম রেটে ধরেছেন। আরো টু পারসেন্ট হাই দিলেও অর্ডারটা আপনারাই পেতেন, বেশ প্রফিট থাকত। অত কম দেওয়ার দরকার ছিল না।

সাগর একটু হাঁ করে রইল। মদিরার কাছ থেকে কথাটা আশা করেনি। বলল—ঠিকই। মজুমদার কত রেট দিয়েছিল?

—আপনাদের চেয়ে অনেক হাই।

সাগর একটু হাসল—কেন হাই দিয়েছিল জানেন?

—কেন?

—ফর দিস্ অফিস অফ্ হিজ্। এস্টাব্লিশমেন্টের খরচের জন্য। ও বড্ড গ্ল্যামার চায়। কম দিলে ওর পোষাত না। আপনার মাইনে, অফিসের ভাড়া, মেনটেনেন্স, ডেকরেশান এসব মিলিয়ে

ওর খরচ অনেক, তাই মজুমদার সব সময়ে রেট বেশী দেয়, কণ্ট্রাক্টও পায় না, আমরা কম রেট দিতে পারি, প্রফিটও করি।

—কর্পোরেশনে আপনারা কত রেট দিচ্ছেন ?

—অনেক কম। এত কমে মজুমদার কখনো নামতে পারবে না। তাই আমরা হাশ্‌মানি নিয়ে অর্ডারটা ছেড়ে দিচ্ছি মজুমদারকে।

মদিরা গম্ভীর হয়ে গেল একটু। নিজের নখ দেখল খানিকক্ষণ। সাগর কৌচের ওপর দিয়ে গড়িয়ে মদিরার কাউন্টারের আরো একটু নিকটবর্তী হয়ে বলল—মজুমদারকে বলবেন এস্টাব্লিশমেণ্টের খরচ আর একটু কমাতে। ও যে পাঁচশো টাকা ফ্ল্যাট ভাড়া দেয় সেটাও বড্ড বেশী টাকা। একা মানুষের অত বড় ফ্ল্যাট দিয়ে কী হবে !

চা এসে গেল, মুশ্‌কো লোকটা কাবার্ড খুলে চীনে ডিজাইনের অন্ততঃ দশ-পনের টাকা দামের পাতলা পোর্সিলিনের পেয়ালায় চা ঢেলে দিয়ে গেল। কাপটির গায়ে সূক্ষ্ম কারুকাজ মুগ্ধ হয়ে দেখল সাগর।

মদিরা হঠাৎ বলল—এটা ওর নেশা।

—কোনটা ? সাগর চায়ে প্রথম চুমুকটা দিয়ে বলে।

—সব সময়ে এই সুন্দর থাকার চেষ্টা, এটাই নেশা। এর জন্য মাঝে মাঝে খুব কষ্ট পায়।

সাগর চুপ করে থাকে। ভাবে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তার হঠাৎ খেয়াল হয়, মজুমদারের সঙ্গে তার কোথায় যেন একটা মিল আছে। নিজের বাড়িতে কত অগাধ টাকা খরচ করে সাগর কত ডেকরেশন করেছে, দেখলে বোধহয় মজুমদারেরও মাথা ঘুরে যাবে।

সাগর চা শেষ করে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা সবে বের করে নাড়াচাড়া করছে, ঠিক সে সময়ে বাইরে একটা চমৎকার পিঙ্ক রঙের গাড়ি এসে থামল। নতুন স্ট্যাণ্ডার্ড গাড়ি। পিছনের দরজা খুলে যেতেই প্রথমে এক জোড়া পা বেরিয়ে এল, পায়ে

কাথবার্টসনের কম্বিনেশন, তার ওপরে হাল্কা ধূসর রঙের দামী প্যাণ্ট, তারও ওপরে একটা বম্বে ডাইং-এর চেকার্ড সার্ট দেখল সাগর। এসব সত্যিকারের পয়সায় কেনা জিনিসের মোড়কে রয়েছে মজুমদার। নেমে দরজা বন্ধ করে কাকে যেন নীচু হয়ে বাই জানাল মজুমদার, হাতটা তুলল, মুখে পেটেণ্ট হাসি। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল।

—আরে চ্যাটার্জির কী খবর ?

সাগর সিগারেটটা ধরিয়ে ফেলল।

মজুমদারের বয়স চল্লিশ সবে পেরিয়েছে। কদিন আগেও পঁচিশ ছাব্বিশ বলে চালিয়ে দেওয়ার মতো চেহারা ছিল মজুমদারের। মাজা গায়ের রঙ্, অত্যন্ত মোলায়েম ব্রণহীন টান গায়ের চামড়া, মাথায় ঢেউ খেলানো ঘাড় পর্যন্ত চুল, কাটা-কাটা চোখা বুদ্ধিদীপ্ত মুখশ্রী। একটু বেঁটে, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। বেঁটে বলে মজুমদারের বিন্দুমাত্র হীনমন্যতা কেউ কোনোকালে দেখেনি। সেই চেহারা এখনো আছে। তবু কোথায় যেন একটা ধস নেমেছে মজুমদারের। চোখের সেই চিকিমিকি বুদ্ধির জোনাকী যেন হঠাৎ নিভে গেছে। চমৎকার লালচে মধুরঙের চুলের রাশিতে ভেসে উঠেছে কয়েকটা রূপোরঙের চুল। একটু অন্যমনস্ক দেখায় মজুমদারকে। আর ঘাড়টায় একটু ঝুঁকে পড়া ভাব। আজকাল মজুমদার পিছন থেকে কেউ ডাকলে টক্ করে ঘাড় ঘোরায় না।

—কথা আছে মজুমদার। সাগর বলল।

মজুমদার মুখের একটু ঝাঁকুনিতে কাঁচের দরজার ওপাশে নিজের ঘরটা ইংগিত করে চমৎকার ভঙ্গীতে হেঁটে গিয়ে দরজাটা ঠেলে ধরে রইল। মুখে সেই হাসিটি। একটু ম্লান, তবু সাদা দাঁতের জন্য হাসিটা এখনো ভালই দেখায়।

সাগর মজুমদারের ঘরে ঢুকেই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়া আর মৃদু একটা ঘর-সুগন্ধীর গন্ধ পেল। লাঙলের মতো আকৃতির বড় গ্ল্যাস টপ্ টেবিল, টেবিলের মুখোমুখি ঘন সবুজ নরম গদীর

চেয়ার। টেবিলের কাঁচের নীচে আমস্টারডাম, সুইজারল্যাণ্ড কাশ্মীরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের রঙীন কয়েকটা ছবি।

মজুমদার তার স্যুইভেল চেয়ারে গিয়ে বসল। ফিল্টার টিপ্‌ গোল্ডফ্লেক ধরাল। তারপর বলল—চ্যাটার্জি, চা?

—এইমাত্র খেলাম।

মজুমদার চাবির রিংয়ের ছোট্ট একটা উকো দিয়ে একটা নখের আগা ঘষে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হাতখানা দেখল, একটু অস্বস্তি বোধ করছে সন্দেহ নেই। বোধ হয় মজুমদারের আত্মবিশ্বাস অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে। কেমন সুন্দর অকপট সত্যের মতো অনর্গল মিথ্যে কথা বলতে পারত, আর চোখ-মুখে হাসির সিনক্রোনাইজড্‌ খেলা দেখাত মজুমদার! ঘোরানো ঘাড়টা আর আজকাল সহজ ভাবে রাখতে পারে না সে।

সাগর একদৃষ্টে চেয়ে ছিল।

মজুমদার শব্দ করে চাবির গোছা টেবিলে ফেলে দিয়ে এক শ্বাস ফেলল। বলল—চ্যাটার্জি, বলুন।

সাগর চোখে চোখ রেখে বলল—আমাদের কালকে অ্যাপয়েন্টমেণ্টটার ব্যাপার কনফার্ম করতে এসেছি।

—ও তো মাণিকবাবুর সঙ্গে ঠিক হয়েই আছে চ্যাটার্জি মুশকিল হচ্ছে আরও দু'একজন টেণ্ডারার নাক গলাতে পারে বলে আন্দাজ করছি।

—নাক গলালে কী হবে?

—কী হবে আপনি বলুন!

—আমরা হাশ্‌মানি কার্টেল করব না মজুমদার।

মজুমদার শ্বাস ফেলল। কথা বলল না।

—ও. কে.? সাগর জিজ্ঞেস করল।

মজুমদার ঘোরানো ঘাড়টা তুলবার একটা চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তল চোখে সাগরকে দেখে নিল একটু। তারপর আস্তে বলল—চ্যাটার্জি, আপনারা তো আমার অবস্থা জানেন।

সাগর নিষ্ঠুর হাসির সঙ্গে বলল—ইট ইজ্‌ এ টাফ্‌ ওয়ার্ল্ড মজুমদার।

—ইনডীড্‌! মজুমদার নিরাসক্ত উত্তর দেয়। সিগারেটের ধোঁয়াটা বুঝিবা বিস্বাদ লাগে তার। হাঁ করে ধোঁয়াটা ছেড়ে মুখটা বিকৃত করে মজুমদার। তার কপালের ঘাম দামী সাদা রুমালে মুছে নেয় এবং এই প্রথম ঘর-সুগন্ধী আর সিগারেটের গন্ধ ভেদ করে এক ঝলক অ্যালকোহলের গন্ধ পায় সাগর।

সাগর একটু চাপা স্বরে বলে—মজুমদার, আজকাল দুপুর থেকেই মাল চালানো হচ্ছে?

মজুমদার কাঠ-হাসি হাসল, বলল—ইনকাম ট্যাক্সের একটা ছোকরাকে খাওয়ালাম। স্কচ। খাওয়াতে গিয়ে একটু খেতেও হল। সেইটেই বিপদ করেছি, একটু খেলে তেষ্টা বাড়ে।

বলে একটা পেপারওয়েট তুলে নিয়ে টেবিলের কাঁচের ওপর একটুক্ষণ গড়িয়ে দিল মজুমদার। তারপর হঠাৎ বলল—যাবেন চ্যাটার্জি?

—কোথায়?

--নিরিবিলিতে কোথাও গিয়ে গেলাস নিয়ে একটু বসি। দি বিল ইজ অন মি!

সাগর একটু দ্বিধা করল। ভরদুপুর, এ সময়টায় সে কখনো খায় না। নানারকম পার্টি ভিজিট করতে হয়। দ্বিধাটা বেশীক্ষণ অবশ্য রইল না। হঠাৎ তার মনে পড়ল কবিতাটা আটকে আছে। রঙীন ও ধনুকের মতো বাঁকা একখানি সাঁকো, ওপাশে স্বপ্নের··· তারপরই রুদ্ধ দুয়ার। কবিতার বদ্ধ অর্গল আর খুলবে না সহজে। কতবার ব্যর্থ করাঘাত করবে সাগর! কিন্তু দূর অন্তরীক্ষে, যেখানে এক মায়াময় জগতে কবিতার শরীর নির্মিত হয়, সেখান থেকে সাবলীল সরীসৃপের মতো বাদবাকী পংক্তি কটা আর নেমে আসবে না বহুদিন। আধখানা কবিতা কোলে নিয়ে বসে থাকবে সাগর অপেক্ষায়। এই একটানা অপেক্ষা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই

সে বলল—চলুন।

খুশী হল মজুমদার। উঠে বলল—দেন লেট আস কল্ ইট্ এ ডে!

বাইরে এসে মদিরাকে লক্ষ্য করে মজুমদার সংক্ষেপে বলল—আর ফিরছি না আজ মদিরা, সময় হলে বন্ধ করে চলে যেও। কাল টেণ্ডারের দিন, একটু তাড়াতাড়ি এসো।

মদিরা কথা বলল না। কেবল উৎসুক চোখ তুলে দুজনকে দেখে কিছু আন্দাজ করার চেষ্টা করল।

সাগর মদিরার দিকেই অপলক চেয়ে রইল একটু। ও কি মজুমদারের প্রতি একটু···? কে জানে বাবা! এসব মেয়েদের হৃদয় বড় একটা থাকে না। নির্মম ঔদাসীন্যে দেহ দান করে। দুর্বল হয় না। কিন্তু মদিরা? সাগর ঠিক বুঝতে পারে না।

বাইরে এসে দুপুরের ফাঁকা একটা ট্যাক্সি ধরে মজুমদার। পিছনের সীটে পাশাপাশি বসে গোল্ডফ্লেক এগিয়ে দিয়ে বলে—আজ মাছের মতো গিলবো; বুঝলেন চ্যাটার্জি?

—কেন?

—এমনিই।

—মজুমদার, আপনাকে দেখে একটা ধ্বংসাবশেষ বলে মনে হয় আজকাল। কেন বলুন তো?

মজুমদার উত্তর দিলে না। একটু চুপ করে থেকে মাথার চুল আঙুল দিয়ে ঠেলে পিছনে টান করতে করতে বলল—কেন মনে হয় চ্যাটার্জি? আমার কি টাক পড়েছে? নাকি চোখের নীচে কাকের পা দেখা যাচ্ছে? বুড়ো দেখাচ্ছে? না তো কী!

—কী জানি! শরীর-টরীর কিছু খারাপ দেখাচ্ছে না। তবু কী একটা হয়েছে।

মজুমদার ঠোঁটে একটা অবহেলার ভঙ্গী করে বলল—ও কিছু না। দুদিন ফুর্তি করলেই ঠিক হয়ে যাবে। টেণ্ডারের জন্য একটু ভাবতে হচ্ছে তো। ভয়ও হচ্ছে। লাখ দুয়েক টাকার কাজ, হাশ্-

মান চলে যাচ্ছে বিশ হাজার, তারপর খাওয়ানো-টাওয়ানো আছে। কী তুলে আনতে পারবো কে জানে!

সাগর মাথা নেড়ে বলে—কাজটা নীট। কোনো ঝামেলা নেই। আপনি মাল কিনতে শুরু করুন, দরকার হলে আমরা মাল সাপ্লাই দেবো। ভাববেন না।

—থ্যাঙ্ক ইউ। বলে মজুমদার। তবু অন্যমনস্ক চোখে চেয়ে চুলে আঙুল ডুবিয়ে বসে থাকে। বোধহয় নিজের অস্তিত্বে ভাঙচুরের শব্দ শোনে। ভেঙে পড়ছে মিনার, স্তম্ভ, দেওয়াল, ভেঙে পড়ছে বিশ্বাস ও ভালবাসা। সাগর ভাবে।

একটা অখ্যাত বার-রেস্টুরেন্ট খুঁজে বের করল মজুমদার। জায়গাটার একটাই গুণ, নিরিবিলি। একটার পর একটা কেবিন ফাঁকা পড়ে আছে। মজুমদার আর সাগর তারই একটায় মুখো-মুখি বসল।

—কী খাবেন চ্যাটার্জি?

—বীয়ার।

—দূর! স্কচ খান। যত খুশী। দি বিল ইজ অন্ মি!

সাগর হাসল।

স্কচেরই অর্ডার দিয়ে মজুমদার সিগারেট ধরাল। বলল—চ্যাটার্জি, একটা কথা বলবেন?

—কী?

—আমি শুনেছি, আপনি মাস্টারী করেন আর কবিতা লেখেন!

—ঠিক।

—কিন্তু আবার আপনিই একজন টাফ্ বিজনেস্-ম্যান। কন্ট্রাক্টরীর লাইনে আমি আপনার চেয়ে ক্রুয়েল লোক দেখিনি। আপনার মাস্টারী আর কবিতা কি একটা ক্যামোফ্লেজ চ্যাটার্জি?

সাগর ভ্রূ কুঁচকে বলে—আমি ক্রুয়েল?

মজুমদার শ্বাস ফেলে বলে—যারা ক্রুয়েল তারা অনেক সময়ে টের পায় না তারা কতখানি ক্রুয়েল। চ্যাটার্জি, আপনি যখন বিজনেস

টার্মসে আসেন তখন কেউ আপনার ওপর এক পয়সা বারগেইন করতে পারে না। আপনার হৃদয় নেই। কী করে হল এই মেটামরফসিস্ ?

স্কচ এসে গেল। নামে স্কচ, আসলে ভেজাল মাল। গেলাসটা মুখে তুলেই বুঝতে পারে সাগর। তবু অনেকটা একবারে গিলে সিগারেট টেনে আস্তে করে বলে—লোকে আমাকে ওরকম তৈরী করেছে মজুমদার।

মজুমদার একটু চাপা গলায় বলে—চ্যাটার্জি, আপনার পার্টনার মাণিক সেন বিজনেস ভালই বোঝে। লোকটার সাহস আছে, চটপটে, এফিসিয়েন্ট। কিন্তু ও আপনাকে যমের মত ভয় পায়, কোনো কাজ আপনাকে না জানিয়ে করে না। অথচ ক্যাপিটালও ওর, আপনি শুধুমাত্র ওয়ার্কিং পার্টনার ছিলেন।

সাগর গম্ভীর হয়ে গেল। বলল—ওসব কথা থাক।

—আমি কথাটা অন্য সেনসে বলছি। আমি জানতে চাইছি, হাউ টু বি ক্রুয়েল লাইক ইউ? আমি কোনোকালে টাফ্ হতে পারিনি। আমার নেচারটা বড্ড উইক চ্যাটার্জি।

গ্লাসটা হাতের মুঠোয় ঘুরিয়ে সাগর গ্লাসের গায়ে নিজের সরু আর লম্বা একটা মুখচ্ছবি দেখল। বলল—আমি সত্যিকারের বিজনেসম্যান নই মজুমদার। আমি আসলে বোধহয় একজন ব্যর্থ কবি। আর ব্যর্থ কবিরা খুব ডেঞ্জারাস হয়।

মজুমদার কথাটা ঠিক বুঝল না। কিন্তু হাত নেড়ে মাছি তাড়ানোর মতো কথাটাকে উড়িয়ে দিয়ে বলল—আপনি এ লাইনে এলেন কী করে ?

সাগর মজুমদারেরর মুখের দিকে চেয়ে বুঝবার চেষ্টা করল লোকটা ইয়ার্কি করছে কি না। না, করছে না। মজুমদারের অর্ধেক মন এখন স্কচের ভিতর ডুবে আছে। আধো-মাতালরা কিছুটা অকপট হয়।

সাগর বলল—আমার বাড়িওয়ালা একবার আমাকে তুলে

দিয়েছিল। যে পদ্ধতিতে তুলে দিয়েছিল সেটা বড্ড মীন। লোকটা খুব একটা খারাপ ছিল না, কিন্তু ওর একটা কালো বেঁটে ঝি টাইপের বৌ ছিল। সেই বৌটা দিনরাত ওপর থেকে গালাগাল করত। অশ্রাব্য গালাগাল। বৌকে বোধহয় লোকটাই লেলিয়ে দিয়েছিল। যাক গে, বিস্তর ঝামেলা শুরু হওয়ার পর আমি বাড়িটা ছেড়ে দিই। একটা বস্তি ধরনের বাসায় গিয়ে উঠি। আর তখন থেকেই আমি আস্তে আস্তে পাল্টে যেতে থাকি। আগে কবিতা লিখতাম, টাকা পয়সা সুখ স্বচ্ছলতা এসব চিন্তাও করতাম না। কবিতা সব ভাসিয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু এখন কবিতাই ভেসে গেছে।

মজুমদার শুনছিল। একটু হাসল। তারপর বলল—ইজ ইট্? তারপর পিছনে হেলে চোখ বুজে একটু ক্লান্ত হয়ে বলল—কিন্তু চ্যাটার্জি, আপনার নিষ্ঠুরতা অর্জিত নয়। ওটা জন্মগত।

সাগন মাথা নাড়ল—না। বাড়িওলা ব্যাপারটা শুরু করেছিল, তারপর ক্রমশঃ ব্যবসায় নেমে আরো অনেক ফড়ে, চীট আর দালাল-দের পাল্লায় পড়ে আমার স্বভাব পাল্টেছে। নইলে আমি ভারী ভাবপ্রবণ মানুষ ছিলাম মজুমদার।

মজুমদার আবার অদৃশ্য মাছি তাড়ানোর মতো হাত নাড়ল। বলল—আমি ব্যবসাতে আছি আজ বিশ বছর। ফড়ে, চীট আর দালাল আমার নিত্যসঙ্গী। তবু আমি ক্রুয়েল হতে পারি না কেন?

—আপনি ক্রুয়েল হতে চান কেন?

মজুমদার দীর্ঘ সময় ধরে মদ্যপান করল নিঃশব্দে। তারপর নিঃশব্দে মুখ তুলে বলল—আই ওয়ান্ট্ টু টিচ হার এ লেসন্!

—কাকে?

—আমার বৌকে।

—সে তো কেটে গেছে শুনেছি। এভাবে কথাটা বলে সাগর লজ্জা পাচ্ছিল। কিন্তু মজুমদার মাইণ্ড করল না।

—ইয়াঃ! বলে ম্লান একটু হাসে মজুমদার, বলে—উইমেনস্

আর এ করাপ্ট্ রেস্ চ্যাটার্জি! এতকালের বৌ, দশ বছর বিয়ের পর ক্লীন হেঁটে বেরিয়ে গেল একটা কমবয়সী ছোকরার জন্য।

—ওসব কথা থাক না মজুমদার।

—আরে দূর, থাকবে কেন? গোপন ব্যাপার তো কিছু নয়, সবাই জানে। ছোকরাটা স্মার্ট ছিল, হ্যাণ্ডসাম ছিল। অনেক পরিবারেই দেখবেন এরকম এক-আধটা ছোকরা আসা-যাওয়া করতে করতে আত্মীয়ের মতো হয়ে যায়। দাদা-বৌদি বলে ডাকত, ফাইফরমাস করে দিত। ওদের মধ্যে যে রিলেশন গ্রো করছে তা অবশ্য আমি বুঝতে পারতাম। বৌয়ের চোখই সে কথা বলে দিত। তবু গা করিনি। কাজকর্ম নিয়ে আছি, বৌ যদি একটু এন্‌জয় করে করুক না। আই ডিড নট্ মাইণ্ড! আচমকা বৌ ডিভোর্স চাইতেই আমি বোম্‌কে গেলাম। ডিভোর্সের কোন দরকার ছিল না, বুঝলেন চ্যাটার্জি? ডিভোর্স ছাড়াই চলত। কিন্তু ছোকরাটার বোধহয় সেনস্ অব পজেশন খুব প্রবল, দখলদারী বা স্বামিত্ব চায়। কিন্তু কী যে মুশকিল! ছোট ছেলেটা একটু নুলো মতো, একটু হাবা, আমার ভারী আদুরে ছিল। বড় ছেলেটাও বাপকে ভালই বাসত। বৌ পরের মেয়ে, কিন্তু বাচ্চাগুলো তো আর তা নয়। বৌকে অনেক বোঝালাম। বুঝল না। এমন কি আমার শাশুড়ী পর্যন্ত এসে বৌয়ের পক্ষ নিল, আমাকে বলল—তুমি মাতাল, মেয়েমানুষের দোষও আছে, আমার মেয়ে যদি আবার বিয়ে করতে চায় তো তাই দেব।

—বিয়ে করেছে? সাগর সামান্য কৌতূহল দেখায়।

—না, এখনো করেনি। ছোকরাটা ভাল চাকরি করে, প্রচুর ঘুষ পায়। আমার বৌ আর শাশুড়ী একটা বাসায় থাকে, সেটার সব খরচা ও দেয়। আমার শ্বশুরবাড়ির তরফটা একটু ইয়ে··· বুঝলেন···ছোটলোক আর কী! পয়সা খুব চেনে। শাশুড়ীরও এই মেয়ে ছাড়া কাছের মানুষ কেউ নেই, আর এক মেয়ে দিল্লী না কোথায় যেন থাকে। যাক গে, তারা এখন সেই আলাদা বাসায়

আছে। ছোকরাটা খরচ দিচ্ছে, ভাল খাচ্ছেদাচ্ছে, বুঝলেন ?

সাগর মাথা নাড়ল।

—সেই বাসায় ছোকরা রোজই যায়, সিনেমা-টিনেমা দেখে, বেড়ায়। বলে একটু চুপ করে ভাবল মজুমদার। তারপর শ্বাস ফেলে বলে—আমিও যাই।

—যান ? সাগর অবাক হয়।

—ওটাই আমার উইকনেস চ্যাটার্জি, বলেছিলাম না কী করে আপনার মতো ক্রুয়েল হওয়া যায়, আমিও হতে চাই ! এইজন্যই বলছিলাম। নুলো ছেলেটার জন্য চকোলেট, জামা প্যাণ্ট কি খেলনা না নিয়ে গিয়ে পারি না। একবার না দেখলে ভারী খারাপ লাগে। এখনো গেলে বাবা বলে ডাকে, বুঝলেন !

—আপনি যে যান, আপনার বৌ আপত্তি করে না ?

—না। এখনো খোরপোষ পাচ্ছে তো, তাই আপত্তি করে না। তবে আমি যে সময়টায় যাই সেই সময়টায়—অর্থাৎ রাত সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা, তখন ও বাসায় থাকে না। শাশুড়ী থাকে, চা করে দেয়, নাকে আঁচল চাপা দিয়ে বিরক্তির সঙ্গে দু'চারটে কথাবার্তাও বলে।

—নাকে আঁচল চাপা দেয় কেন ?

—মদের গন্ধ পায় যে ! আমি ঘণ্টাখানেক আমার ছেলে দুটোর মধ্যে ডুবে থাকি। বুঝলেন চ্যাটার্জি, ছেলে দুটো ছাড়া আমার আর কোনো পিছুটান নেই। সেদিক দিয়ে আমি মুক্তপুরুষ।

সাগর বোধহয় একঝলক কমলার কথা ভাবল। বিষণ্ণ হয়ে গেল মনটা। আস্তে করে জিজ্ঞেস করল—স্ত্রীর জন্য আপনার কষ্ট হয় না ?

মজুমদার একটু ভ্যাবলা চোখে চেয়ে রইল সাগরের মুখের দিকে। তারপর গ্লাস তুলে অনেকক্ষণ ধরে স্কচ খেল। পাঁপড় ভাঙল একটুকরো, হাতটা কাঁপছে, পাঁপড়টা মুখের কাছে তুলে আবার কী ভেবে অ্যাসট্রের ভিতরে গুঁড়ো করে ফেলে দিল। বলল—চ্যাটার্জি, কেবলমাত্র সেক্সুয়াল রিলেশন থাকলে মেয়েপুরুষ কখনো

সত্যিকারের স্বামী-স্ত্রী হতে পারে না। আমার হয়েছিল তাই। আমাদের রিলেশনটা কেবল ওটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উই নেভার বিকেম রিয়াল হাজব্যাণ্ড অ্যাণ্ড ওয়াইফ। কিন্তু তবু বলি, বৌটার জন্য একটু কষ্ট কখনো-সখনো হয়। মাঝরাতে হঠাৎ নেশা ছুটে জেগে উঠলে, বা যখন শাড়ির দোকানের পাশে হাঁটি বা যখন বন্ধুবান্ধবদের দেখি বৌয়ের নামে বাড়ি-টাড়ি করছে তখন হয়। কিন্তু সেটা কাটিয়ে ওটা শক্ত নয়। বৌ ছেড়ে চলে গেছে বলে একটা রাগ তো আছেই, সেটাকে চাগিয়ে তুলি মনের মধ্যে, চিড়-বিড় করে গাল দিই অশ্রাব্য সব ভাষায়—বেশ্যা-কেশ্যা বা ঐ ধরনের সব কথা। রাগটা চাগিয়ে উঠলে কষ্টটা একটু কমে। রাগের ঝাঁজটা কিন্তু ভারী ডিলিশাস্। একা একা বৌয়ের ওপর রাগ করে মনে মনে নানারকম ডায়ালগ তৈরী করে দেখবেন, বেশ সময় কেটে যায়, ভাল লাগে।

সাগর হেসে ফেলল।

—ভুল বললাম চ্যাটার্জি?

সাগর মাথা নেড়ে বলে—না। ভুল বলেননি।

—বৌয়ের ওপর রাগ করতে ভাল লাগে না?

—লাগে।

—ডিলিশাস্।

বলে চুপ করে থাকে মজুমদার। দুজনে কিছুক্ষণ নীরবে মদ খায়।

মজুমদার এক সময়ে হঠাৎ বলে—আমাকে আপনার ঘেন্না হচ্ছে?

—ঘেন্না হবে কেন?

—আমার জায়গায় আপনি হলে চ্যাটার্জি, আপনি কিন্তু কিছুতেই বৌয়ের বাসায় যেতেন না। যেতেন?

—না। সাগর তার ভরাট গলায় নিশ্চিত স্বরে কথাটা বলে।

—জানতাম, আপনার ক্রুয়েলটিটা ভারী সুন্দর। হিংসে হয়। আমি না গিয়ে পারি না।

—এসব ব্যাপারে একটু শক্ত হতে হয় মজুমদার। নিজেকে

সহজপ্রাপ্য করে তুললে দাম থাকে না।

—জানি চ্যাটার্জি, তবে নিজেকে বদলাবার সময় মানুষের একসময়ে পেরিয়ে যায়। আমি সোমনাথ মজুমদার আর কোনদিনই সাগর চ্যাটার্জি হতে পারব না।

বিল মিটিয়ে দিয়ে যখন তারা উঠল তখন বিকেল পড়ন্ত। এ সময়ে বেলা বড় তাড়াতাড়ি ফুরোয়। সাগরের ঝুমঝুমে একটু নেশা হয়েছে। মজুমদার একটু বেশী অনর্গল কথা বলছে তবে মাতলামি করছে না। সাগর ওর কথায় আর কান দিতে পারছিল না। কবিতার দুষ্প্রাপ্য পংক্তি তার মাথার ভিতরকার এক গাছকে নাড়া দিচ্ছে। টুপটাপ ফুলের মতো অসংলগ্ন কিছু শব্দ ঝরে পড়ে। কষ্ট হয় সাগরের।

এ সময়ে ট্যাক্সি পাওয়া মুশকিল। অফিস ভেঙেছে সদ্য। সাগর একটা ওষুধের দোকান থেকে অফিসে ফোন করল। ড্রাইভার মুকুন্দ এ সময়ে ফোন ধরে। সে-ই ধরল।

—গাড়িটা নিয়ে এস মুকুন্দ।

—কোথায় আছেন আপনি?

সাগর জায়গাটা বলল।

তারপর দুজনে কথা বলতে বলতে চতুর্দিকের উল্টোপাল্টা জনস্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল।

সাগর জিজ্ঞেস করল—কোথায় পৌঁছে দেবো মজুমদার? আমার গাড়ি আসছে।

—কোথায় যাবো? এখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব খানিক, তারপর সন্ধ্যে হয়ে গেলে ছেলে দুটোকে দেখতে যাবো। একটু রাত হবে। বেরিয়ে এসে আর খানিকটা গিলে বাসায় ফিরব।

—আমি আপনাকে কিছুক্ষণ কম্প্যানী দিতে পারি।

মজুমদার একটু চুপ করে থেকে বলে—অলরাইট চাটার্জি, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, কালকের পেমেন্টের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই তো?

—আপনি তো দিচ্ছেন!

—দিচ্ছি, ক্যাশ ডাউন। এই অর্ডারটা না পেলে আমি টিঁকে থাকতে পারব না।

—তাহলে আর সন্দেহ কী ?

—চ্যাটার্জি, আর কোনো পার্টি যেন না আসে।

—আসবে কেন ?

—এর আগে সাপ্লাইয়ের অর্ডারটার সময়ে মাণিকবাবু কয়েকজন উটকো লোককে ধরে এনেছিলেন টেণ্ডারার হিসেবে। ওরা তা নয়, বেকার বন্ধু-টন্ধু হবে। কিছু মুফৎ পাইয়ে দেওয়ার জন্য ওদের ভেড়ানো। ওরকম কিছু যেন না হয় দেখবেন।

মাণিকটার কোনোকালে আক্কেল নেই। ও মাঝে মাঝে দু'চারজন বন্ধুকে টেণ্ডারার বলে চালিয়ে হাশ্‌মানি আদায়ের চেষ্টা করে। সাগর ভ্রূকুঁচকে বিরক্ত চোখে সামনের দিকে চেয়ে রইল একটু। লজ্জা করছিল তার। বলল—হবে না, কিন্তু পেমেণ্টের ব্যাপারে যেন কোনো—

মজুমদার হাত বাড়িয়ে সাগরের হাত ধরল, তারপর হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলল—যে ছোকরাটার জন্য আমার বৌ ভেগেছে সেও একজন কবি, বুঝলেন চ্যাটার্জি ?

সাগর চমকে বলে—কী নাম ?

—কিছু একটা হবে। বলে হাসল, তারপর বলল—কবিরা খুব ডেঞ্জারাস হয় চ্যাটার্জি। একটা জীবন আমি কবি-টবিদের পাত্তাই দিইনি। কিন্তু এখন কবি শুনলেই আমার ভিতরটা চমকে ওঠে।

—বটে ?

—তাই আজকাল আমি কবিতা পড়ি।

—সে কী ?

মজুমদার হাসে—মাইরি পড়ি। রাশি রাশি বই কিনেছি। পড়ি, কিছু মাথায় ঢোকে না। শব্দগুলো মাথার ভিতরে খটাখট করে নড়েচড়ে, ঘুঁটির মতো। তবু পড়ি, বোঝবার চেষ্টা করি।

—আশ্চর্য ! খামোকা অত কষ্ট করেন কেন ?

--আই ওয়াণ্ট টু বি এ পোয়েট চ্যাটার্জি ! কবিরা খুব নিষ্ঠুর হয় চ্যাটার্জি।

নতুন একটা সবুজ ফিয়াট সামনে এসে দাঁড়াল, মুকুন্দ দরজা খুলে দেয় ভিতর থেকে।

—চলুন মজুমদার। বলে সাগর। দুজনে ওঠে।

॥ চার ॥

রাত গড়িয়ে যাচ্ছে। নটার গাড়ির প্যাসেঞ্জাররা এসে গেল। সাগর ফিরল না।

দোতলার বারান্দা থেকে কমলা পুকুরপাড়ের রাস্তায় চলন্ত লোকজন দেখে ঘরে এল।

সিন্ধু ভাইপো-ভাইঝিদের নিয়ে মেঝেয় বসে গল্প ফেঁদেছে, গনপৎ এখনো ছাদে ঘুমোচ্ছে।

কমলা বলে—তোর দাদা সেই দশটার গাড়িতে আসবে হয়তো। অনেকটা জার্নি করে এসেছিস, তোদের ভাত দিই, খেয়ে শুয়ে পড়।

সিন্ধু মুখ তুলে বলে—খিদেই নেই, খাবো কোন্ পেটে? দাদা আসুক।

কমলার বুক একটু কাঁপছিল। সাগর যদিও কখনো মাতাল হয়ে ফেরে না, তবু মাঝে-মধ্যেই আজকাল একটু-আধটু খেয়ে ফেরে। একটু লালচে দেখায় তখন সাগরের মুখ, চোখ জ্বলজ্বল করে, ভলকে ভলকে অ্যালকোহলের গন্ধ পাওয়া যায়। সিন্ধু কখনো তো দাদার এ অবস্থা দেখেনি। যদি দেখে তাহলে কী ভাববে! কমলা তাই চায় না আজ রাতে দুই ভাইয়ে দেখা হোক।

বলল- শুধু শুধু বসে থাকবি কেন? নীচের ঘরে বিছানা পেতে মশারি টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুটো যা পারিস খেয়ে গিয়ে শুয়ে পড়। দাদা তো পালাচ্ছে না।

—বড্ড জ্বালাও বৌদি, বলছি দাদা আসুক! কতকাল দাদার সঙ্গে দেখা নেই।

—আহা, দেখা তো ভারী! তোরা দু'ভাইয়ে তো কথাই বলিস না। দাদার সামনে কেন কাঠ হয়ে থাকিস সিন্ধু, দাদা কি বাঘ ভালুক?

সিন্ধু হাসল, বলল—আমাদের সম্পর্কটা ওরকমই দাঁড়িয়ে গেছে। দাদা আমার চেয়ে কত বড় জানো? বারো বছরের। তা বলে ভেবো না যে ভাইয়ে ভাইয়ে মিল নেই!

—তা ভাবি না রে, সবই জানি। তোদের সংসারে আমি তো নতুন বৌটি নই। আমাদের বাপের বাড়িতে দাদাদের কিন্তু তোদের মতো সম্পর্ক নয়। হৈ হুল্লোড় করে, ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে, ঠিক বন্ধুর মতো। তোরা দুভাই যেন দুই আধচেনা ভদ্রলোক, বহুদিন বাদে দেখা।

কমলা আবার বারান্দায় আসে। নীচের রাস্তার দিকে তাকায়। ভয় করে। সিন্ধু তার দাদাকে কত গভীর ভালবাসে, সেখানে সামান্য মাত্র কোনো আঘাত কমলাও সহ্য করতে পারবে না।

আরও প্রায় চল্লিশ মিনিট পর সিন্ধু হাই তুলতে লাগল। চোখ দুটো রক্তাভ। জয়া আর সৈকত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বারান্দায় বৌদির কাছে এসে সিন্ধু বলে—দাদা বড্ড ঝোলাচ্ছে তো আজকে! কাল সারাটা রাত ঠায় জেগে এসেছি। আর পারা যাচ্ছে না।

- গনপৎকে ডাক, খেতে দিই।

—তাই দাও। কাল সকালেই দাদার সঙ্গে দেখা হবে দেখছি।

কমলা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

ওরা খেয়ে শুতে চলে গেল।

অবসর পেয়ে আবার অন্ধকার বারান্দায় এসে দাঁড়াল কমলা। উদ্বেগ নিয়ে চেয়ে থাকে।

এগারোটার ঘন্টি পড়ল দেয়াল-ঘড়িতে। ঝি মেয়েটা খাওয়ার ঘরের মেঝেয় পড়ে ঘুমোচ্ছে। বড্ড মশা কামড়ায়। ঘুম-চোখেই চটাং চটাং মশা মারছে।

একটা সাদা আলো বাঁক ফিরে রাস্তায় পড়ল। খুব উজ্জ্বল

আলো। ফিয়াট গাড়িটা মোড় ঘুরে বাঁক নিতেই কমলা অনেকক্ষণ চেপে থাকা একটা শ্বাস বুক থেকে ছাড়ে। তারপর গ্রীলের গেট-এর তালার চাবি নিয়ে নীচে নেমে আসে।

নেশা সামান্য বেশী হলে সাগর গাড়িতে আসে।

গেট খুলে কমলা দাঁড়িয়ে থাকল। সাগর যখন গাড়ি থেকে নামল তখন তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করল কমলা। না, ভয়ের কিছু নেই। স্বাভাবিকই আছে সাগর। পা টলছে না। গাড়ির জানালায় ঝুঁকে মুকুন্দকে চলে যেতে বলল। গলাটা পরিষ্কার, জড়ানো নয়।

মুখোমুখি দেখা হয়। কিন্তু কথা বড় একটা হয় না। আজও হত না, কেবল কমলা চাপা স্বরে বলল—সিন্ধু এসেছে।

—সিন্ধু!

সিঁড়ির আলোটা মাত্র ষাট পাওয়ারের। এ অঞ্চলে বিদ্যুৎ বড় কমজোরী, তাই সেই আলোতে কারো মুখের ভাবান্তর বোঝা কষ্টকর। তবু কমলা দেখল 'সিন্ধু' উচ্চারণ করেই সাগরের মুখের রুক্ষ রেখাগুলি সহজ নম্রতায় ডুবে যায়। স্নিগ্ধ হয়ে আসে মুখশ্রী।

—কোথায়?

—ঘুমিয়েছে।

—বাড়ির খবর কি?

—ভাল।

আর কথা হল না। নিঃশব্দে তারা আবার ওপরে আসে। সাগর পোশাক ছাড়ে। বাথরুমে যায়। খেতে বসে।

সবই অফিসের কাজের মতো নিয়মমাফিক হয়ে যায়।

সারারাত মোষের মতো ঘুমিয়েছে সিন্ধু। একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমোতো, কিন্তু পারল না গনপতের জন্য। ভোর-ভোর উঠে গনপত আজকাল এক্সারসাইজ করে ভুঁড়ি কমানোর জন্য। গনপতের দোষ নেই। সিন্ধুই তাকে বলে বলে ব্যায়াম ধরিয়েছে, বলেছে—গায়ের

চর্বি কমা রে মেড়ো, নইলে তোর দ্বারা হার্ড্‌শীপ হবে না। মাড়োয়ারীদের গুণগুলো কিছু পাসনি, দোষগুলো আছে পুরোমাত্রায়।

—সে কেমন? জিজ্ঞেস করেছে গনপত।

—এই যে তোর থল্‌থলে ভুঁড়ি, গায়েগতরে চর্বির থাক—এ সব হচ্ছে মাড়োয়ারীর দোষ। আর মাড়োয়ারীর যে ব্যবসায় মাথা, কষ্টসহিষ্ণুতা, এসব গুণ তোর নেই, তুই একটা কিম্ভূত। পুরো মাড়োয়ারী হতে না পারিস, রোগাভোগা চালাকচতুর বাঙালী অন্ততঃ হ', নইলে তোকে নিয়ে করবো কী?

সেই থেকে গনপতের এই ব্যায়াম। সকালে সে প্রাণপণে শরীর ভেঙে, দাঁড়িয়ে উপুড় হয়ে হাতের আঙুলের ডগায় পায়ের বুড়ো আঙুল ছোঁয়ার চেষ্টা করে। পিছনে হেলে আর্চ করে। আরো নানারকম কসরৎ করে। কিন্তু কোনোটাই ঠিকঠাক হয় না। তবু চেষ্টা আছে।

আজও ঘুম ভেঙে সকালে সে এইসব প্রাণপাত ব্যায়াম করছিল। দমফোট হয়ে বিকট শ্বাসের শব্দ তুলে হাঁফাচ্ছে, সেই হ্যাঁদানো শুনেই সিন্ধুর ঘুম ভাঙল। গনপত আবার কোঁকানির শব্দও তুলছিল।

—কীরে গনফট্?

—বেমক্কা কোমরটায় চোট লেগে গেল রে, মট্ করে গেছে!

—এক্‌সারসাইজ করছিলি?

—তা নয়তো কী? মেলা হার্ডশীপ করাচ্ছিস আমাকে দিয়ে।

সিন্ধু হাসল, উঠে বসে বলল—মেড়ো ভূত, একদিনে কি দারা সিং হতে চাস? ওসব সইয়ে সইয়ে করতে হয়। তোর সাতপুরুষে কেউ ব্যায়াম করেনি তা জানিস? তোর শরীরের ধাতই আলাদা।

—দেখিস, একদিন ফিঙে পাখির মতো রোগা হয়ে যাবো।

—যাস, আর হ্যাঁদাস না। এখন একটু দম নে। ওটা কী পরে আছিস?

-স্পোর্টস্ প্যাণ্ট্। বলে গনপত লজ্জায় একটু হাসে।

সিন্ধু মশারি তুলে গনপতের পোশাক দেখে হেসে বাঁচে না। খাটো প্যাণ্ট পরা, খালি গা, মোটা গনপতকে এক প্রকাণ্ড চেহারার খোকার মতো লাগছে।

—কাপড় পর হারামজাদা। তোর এই পোশাকে বৌ তোকে দেখেছে কোনদিন ?

—রোজ দেখে তো!

—তবু ডিভোর্স করেনি ?

—দূর শালা, ডিভোর্স করবে কী, এই শরীরের তেজই সামলাতে পারে না।

—পাছায় দুটো লাথি কষাবো, শীগ্‌গীর কাপড় পর। আর হার্ডশীপের দরকার নেই!

গনপত ছাড়া ধুতি পরে নিতে নিতে বলল—মাইরি, কোমরটায় মচাং করে গেছে।

সিন্ধু বাথরুম ঘুরে এল, বলল—চল্‌ চায়ের যোগাড় দেখি। সকালের পয়লা কাপ পেটে না গেলে দিনটা আমার শুরুই হয় না।

—বাঙালীর ঐ দোষ। আমাদের সকাল শুরু হয় বড় রূপোর গেলাস-ভরা দুধ দিয়ে। এই পুরু সরওলা দুধ, শরীরে তক্ষুনি তাকৎ এসে যায়।

—তোর তাকৎ বিস্তর দেখা আছে। বেশী বকিস না, দুধ না খেয়েও আমি তোর দশগুণ খাটতে পারি।

—জণ্ডিস তো বাঁধিয়েছিলে বাবা, চা খেয়ে খেয়ে। বেশী বোকো না।

ওরা ওপরে এসে দেখল বাচ্চারা পড়তে বসেছে বুড়ো এক মাস্টার মশাইয়ের কাছে, বৌদি রান্না ঘরে খুটখাট করছে, দাদা ওঠেনি। খুব বেলা হয়নি এখনো। বড়জোর সাত, সাড়ে সাত।

খাওয়ার টেবিলের ধারে বসতে বসতে সিন্ধু বলে—দাদা কত রাত্রে ফিরেছিল বৌদি ?

—এগারোটা হবে।

—শেষ ট্রেনে ?

—না। গাড়িতে।

—কোম্পানির ?

—হ্যাঁ।

—কাল রাতে মড়ার মতো ঘুমিয়েছি, কিছু টের পাইনি ! দাদাকে বলেছো আমরা এসেছি ?

—বলব না !

—দাদা ওঠে কখন ?

—বেশী রাতে ফিরলে বেলায় ওঠে। তোরা বোস। ওকে আজ আগেই ডেকে দেবো।

—না না, ঘুমোচ্ছে ঘুমোক। দাদা ভীষণ খাটে।

কমলা হাসল। করুণ মধুর হাসিটি। দাদা আর ভাইয়ের নীরব গভীর ভালবাসার কথা সে যে জানে তা তার হাসিতেই প্রকাশ পায়। বলল—তোর দাদা তোর কথা শুনেই কেমন হয়ে গেল। মুখে কেমন যে ভালোবাসা মায়ামমতা ফুটে উঠল। তুই যেমন তার মতো দাদা দেখিস না, সেও তেমনি তোর মতো ভাই দেখে না।

সিন্ধু হাসে। বলে—তা নয়। আসলে আমরা তো মোটে দুই ভাই। তার ওপর দাদার বারো বছর পর আমার জন্ম, তাই একটু বেশী টান আর কি !

কমলা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—তবু ভাল তুই এসেছিস, এবার ওর মুখটা কদিন একটু হাসিখুশী দেখব। নইলে আজকাল বড্ড কাঠখোট্টা হয়ে থাকে।

—কেন ?

—কে জানে ! ব্যবসা করে করে মানুষটা কেমন হয়ে গেছে।

সিন্ধুকে একটু অন্যমনস্ক দেখাল। কিছু বলল না।

গনপত হাই তুলে বলল—বৌদি, আমাকে পাতলা লিকারের চা দেবেন। কড়া চা খেতে পারি না।

—চা খাওয়ার দরকার কী, বরং এক গ্লাস দুধ খান। বাড়ির খাঁটি দুধ।

গনপত ভারী অবাক হয়ে গেল, অপ্রত্যাশিত দুধের কথায়। বলে—বৌদি, আপনি হাত গুনতে জানেন বোধহয়। আমি বাড়িতে দুধই খাই। চা যদি কখনো-সখনো হয় তো সে মালাই-চা।

—সেটা আবার কী? কমলা জিজ্ঞেস করে।

সিন্ধু আগবাড়িয়ে বলে—সে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড বৌদি, চায়ের সঙ্গে তেজপাতা সেদ্ধ করে, ঘন দুধ আর চিনি দিয়ে দুধের সরকর মিশিয়ে এলাচ লবঙ্গ দারচিনি দিয়ে এক অখাদ্য হয়। মেড়োরা ছাড়া কেউ খেতে পারে না।

—হ্যাঁ, খেতে পারে না। চা আবার একটা খাদ্য নাকি? মালাই-ফালাই না দিলে ও তিত্‌কুটে জিনিস কেউ খায়? গনপত বলে।

কমলা বলে—সিন্ধু, তুই গনপতের পিছনে লাগিস না। অভ্যাস নেই যখন তখন ওকে চা দেবো কেন? ও দুধ খাক, তুই বরং ঐ চা গুচ্ছের গিলে লিভারের বারোটা বাজা।

সিন্ধু টেবিলের তলা দিয়ে গনপতকে একটা লাথি কষাল। চাপাস্বরে বলে—ব্যাটা, ঠিক ম্যানেজ করলে!

গনপত হাসে। বলে—বৌদি, চা খেয়ে খেয়ে ওর চোখ হলদে হয়ে গেছে। তবু খাবে।

কমলা সিন্ধুর দিকে একটু চেয়ে থেকে বলে—তোমাকেও চায়ের পর গেলাসে করে দুধ দেবো। চুপটি করে খেয়ে নেবে। যা চেহারা করে এসেছো!

—দুধ-টুধ বহুকাল খাই না, ও কি পেটে সইবে?

—দেখা যাক। কিন্তু খেতে হবেই।

* * *

সাগর খুব বেলা করল না। আটটা নাগাদ উঠে পড়ল! চায়ের টেবিলে আসতে আসতে সাড়ে আটটা। পরনে দামী ড্রেসিং

গাউন, মুখে চুরুট। মুখশ্রীতে একটা খুশীর ভাব।

কিন্তু সিন্ধু লক্ষ্য করে, দাদার চেহারাটা কেমন কর্কশ আর চোঁয়াড়ের মতো হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টিতে একরকম হতাশ ভাব। সাফল্যের অভাবজনিত যে ক্লান্তি নিম্নমধ্যবিত্ত প্রৌঢ় মানুষের চোখে দেখা যায় সেইরকম একটা ক্লান্তি। অথচ সাগর তো অসফল নয়! বরং খুবই খারাপ অবস্থা থেকে এখন সে প্রায় লক্ষপতি। যৌবন এখনো তার যাওয়ার কথা নয়—সিন্ধুর ছাব্বিশ চলছে, সাগরের তাহলে এখন বড়জোর আটত্রিশ বছর বয়স। এ বয়সে ক্লান্তি আসবে কেন?

সিন্ধু প্রণাম করবার সময়ে পিঠে দাদার হাতখানার মৃদু সস্নেহ ভাবটি টের পেল। উঠতেই দাদা বলে—শরীর-টরীর কেমন রে? রোগা দেখছি!

—ও কিছু না।

—মা বাবা?

—ভালোই।

—ক'দিন থাকবি তো?

—টেণ্ডারের জন্য এসেছি। আর. পি. ডব্লিউ. ডি-র রেজিস্ট্রেশনটা কতদূর কী হল, তা জানতে।

—রেজিস্ট্রেশন পাসনি এখনো?

—না। ওটা নইলে গভর্ণমেণ্টের অর্ডার পাওয়া মুশকিল।

সাগর ভ্রূ কুঁচকে একটু কী ভেবে বলে—ভট্চাযকে ফোনে বলে রাখব'খন, হয়ে যাবে। একটা চিঠিতে আগে থেকে যদি লিখতিস আমাকে তবে কবে করিয়ে রাখতাম।

—ওটার জন্য ফুড কর্পোরেশনের দুটো টেণ্ডার দিতে পারলাম না।

—আমাকে জানাসনি কেন?

সিন্ধু চুপ করে থাকে। দাদাকে এসব ছোটখাটো ব্যাপারে সে জড়াতে চায় না। ব্যবসাদার দাদাকে সে মনে মনে পছন্দ

করে না তেমন, কবি দাদাই এখনো তার মন জুড়ে আছে, তাই ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে সে দাদাকে এড়িয়ে চলে বরাবর।

সাগর গনপতকে চিনতে পারল, বলল—ঘনশ্যামজীর ছেলে না তুমি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। গনপত উঠে প্রণাম করে।

—গনপতি ! বাঃ, বেশ বড় হয়ে গেছ। কী করো এখন ?

—সিন্ধুর সঙ্গে ব্যবসা করছি।

সাগর হাসল। বলল—সবাই ব্যবসাদার এখন !

অন্ততঃ ত্রিশ টাকা কিলো দরের চায়ের সুঘ্রাণে ঘর ম-ম করে ওঠে। বৌদি তৃতীয়বার চা করল। গোলাপের মত সুগন্ধি এমন চা সিন্ধু কখনো খায়নি। দাদার বাড়িতে যে এস্‌টাব্লিশমেণ্ট খরচা বহুগুণ বেড়ে গেছে তা টের পাচ্ছিল সিন্ধু। চতুর্দিকে একটা অপব্যয় এবং বেপরোয়া খরচের চিহ্ন ছড়ানো। সে নিজে অপব্যয় অপছন্দ করে। হার্ডশীপ তার বীজমন্ত্র ; সে তাই চতুর্দিকে এত আসবাব, ঘরের মধ্যে বাগান, দামী দামী আলো, দাদার ড্রেসিং গাউন কিংবা খুব দামী চায়ের অর্থ খুঁজে পাচ্ছিল না এবং বুঝতে পারছিল না যে এত সচ্ছলতার মধ্যে থেকেও তার দাদা অত ক্লান্ত কেন !

এলাহি ব্রেকফাস্টের আয়োজন করল বৌদি। পুরু মাখন মাখানো টোস্ট, সঙ্গে দুটো করে ডিম-সেদ্ধ, কাটা আপেল, ভাল কেক, প্রোটিনেক্স মেশানো দুধ এক গ্লাস। সাগর দিনে বাড়িতে ভাত খায় না, বাইরে স্কুলের পর লাঞ্চ করে কোনো হোটেলে। ব্রেকফাস্টটা তাই একটু ভারী খায়। কিন্তু সিন্ধু অত খেতে পারছিল না। বৌদি তাড়া দিয়ে খাওয়াল—না খেলে বেরোতে দেবো না, সারাদিন টো টো করে সেই কোন্ দুপুর হয়ে যাবে ফিরে ভাত খেতে।

স্টেশন প্রায় এক মাইল। সোয়া নটায় দাদার মাসিক বন্দোবস্তের রিকশা এসে গেল। সিন্ধু দাদার সঙ্গে এক রিকশায় যেতে একটু সঙ্কোচ বোধ করে, তার ওপর গনপত রয়েছে—একটা রিকশায় হবেও না। সাগর আর একটা রিকশা ডাকতে ঝি-মেয়েটাকে

পাঠাচ্ছিল। সিন্ধু বারণ করে বসল—দুজন হাঁটতে হাঁটতে এটুকু রাস্তা চলে যাবো, নতুন জায়গাটা দেখাও হয়ে যাবে। তাছাড়া, বেরোবোও একটু পরে। রাইটার্সের কাজ তো এগারোটার আগে শুরু হয় না।

—সাবধানে যাস। কলকাতা আজকাল যা হয়ে উঠেছে। এই বলে সাগর বেরিয়ে যায়।

বেরুবে বেরুবে করেও দেরি করতে থাকে সিন্ধু। খবরের কাগজটা উল্টেপাল্টে দেখে, আর একবার চায়ের অর্ডার দেয়। জয়া আর সৈকত এসে বাঙালী আর মাড়োয়ারী কাকুর সঙ্গে একটু হুড়োহুড়ি করে। তারপর স্কুলের বেলা বুঝে স্নান করে খেতে চলে যায়।

বৌদি সেই সুগন্ধী চা নিয়ে এসে খাওয়ার টেবিলে রেখে বলে—বেলা যখন করলিই তখন একেবারে স্নান করে খেয়ে যা। রান্না ততক্ষণে হয়ে যাবে।

সিন্ধু বলে—দূর! ফিরে এসেই খাবো।

—অবেলা হয়ে যাবে। খেয়ে হজম করতে পারবি না। রাতে আবার তোর দাদা কী সব খাবার আনবে, আমাকে রান্না করতে বারণ করে গেছে, সে-সব গুচ্ছের দামী খাবার কে খাবে?

সিন্ধু অবাক হয়ে বলে—কী খাবার আনবে?

বৌদি একটু হাসে, বলে—চীনে রেস্টুরেন্টের কী সব যেন আনবে বলছিল। সুইট অ্যাণ্ড সাওয়ার চিকেন, ফ্রাইড রাইস, রোল, রোস্ট আর নকুরের মিষ্টি-টিষ্টি। হট-বক্সে ভরে গাড়িতে করে আনে মাঝে মাঝে। আজ তোদের অনারে আমার এক বেলার খাটুনি বেঁচে গেল, মুখটাও বদল হবে।

সিন্ধু মনে মনে একটু হিসেব করল। বলল—সে বেশ অনেক টাকার ব্যাপার বৌদি! না?

—টাকাকে টাকা মনে করে নাকি তোর দাদা? আজ তোদের জন্য আনছে তাতে কিছু বলার নেই। কিন্তু এরকম প্রায়ই করে

তোর দাদা, বেশীর ভাগ দিন দু'বেলার একবেলাও বাড়িতে খায় না।

বলতে বলতে কি বৌদির চোখ একটু ছলছলে হয়ে এল? গনপত গেছে জয়া আর সৈকতের সঙ্গে পুকুরে হুড়োহুড়ি করতে। বৌদি তাই চোখের রাশ টানল না। জলটা একটু পরেই গাল বেয়ে গড়িয়ে নামল।

সিন্ধু একটু অবাক হল। কিন্তু মনের কোন গুপ্ত গভীরে সে প্রত্যাশা করছিল, দাদা ঠিক আর স্বাভাবিক নেই। বৌদির সঙ্গে দাদার সম্পর্কটা যেন বা এক গোলমেলে হয়ে গেছে।

স্বভাব-চাপা সিন্ধু চুপ করে থাকল একটু। তারপর আস্তে করে বলল—কেঁদো না, বরং যদি কোনো গোলমাল হয়ে থাকে তবে খুলে বলো।

কমলা আঁচলে চোখটা মুছে কান্নাটা সামলে নিয়ে বলে—বাঙালী মেয়েদের কথায় কথায় চোখে জল আসে!

—বুঝলাম। কিন্তু ট্রাবলটা কী?

—ট্রাবল আবার কী! কিছু না।

—ভাঁড়িও না বৌদি। বলো।

কমলা অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বলে—সিন্ধু, তোর দাদার ধারণা আমিই তার সর্বনাশ করেছি।

—কী রকম?

—সে আর কবিতা লিখতে পারছে না। তার বিশ্বাস, আমার জন্যেই পারছে না।

সিন্ধু অবাক হয়ে বলে—তার মানে?

—একসময়ে যখন কেবলমাত্র ইস্কুলমাস্টারী করত, যখন আমাদের ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোতো না, তখন সেইসব অভাবের দিনে তোর দাদা বুকে বালিশ চেপে কবিতার পর কবিতা লিখে যেত স্বচ্ছন্দে। খুব নামডাক তখন তার। বড় বড় সব কাগজে তখন সাগরশঙ্কর চ্যাটার্জির কত সুখ্যাতি বেরোতো, সেসব দিনেই

ও ছিল ভাল।

সিন্ধু কি এটাই প্রত্যাশা করেনি? উগ্র আগ্রহে সে জিজ্ঞেস করল—তারপর?

—তারপর একদিন তো কবিতা ছেড়ে তোর দাদাকে ব্যবসায় নামতে আমিই বাধ্য করলাম বলেকয়ে। টাকা ছাড়া যে কিছুতেই এই সমাজে মানুষের মতো বাঁচা যায় না তা তোর দাদাও বুঝেছিল। নইলে নামকরা একজন তরুণ কবি, যার প্রশংসায় মস্ত মস্ত লোকেরা পঞ্চমুখ, যাকে সাহিত্যসভায় লোকে চেয়ার ছেড়ে উঠে সম্মান দেখায়, তাকে কেন একটা অশিক্ষিত ইতর বাড়িওলা যা নয় তাই বলে অপমান করার সাহস পায়? সেই থেকে তোর দাদা লাগল কবিতা ছেড়ে টাকার পেছনে। টাকা এল বটে কিন্তু কবিতা সেই যে ছেড়ে গেল আর ধরতে পারল না।

—কেন বৌদি?

—তার আমি কি জানি! শুধু তোর দাদাকে দেখে দেখে একটা জিনিস বুঝতে শিখেছি যে, কবিতা লেখা যতটা সহজ বলে লোকে ভাবে তত সহজ ওটা নয়। কবিতার রহস্য বোঝে একমাত্র কবিরাই। তোর দাদা যে কবিতা লিখতে পারছে না তার কারণ কি ওর শব্দ জানা নেই, না ছন্দ মেলাতে পারে না, নাকি কবিতার টেকনিক ভুলে গেছে! ওসব কিছুই নয়। যে-মনটা কবিতা লিখে ওর সেই মনটা হয়ে গেছে ব্যবসাদার। ওর এই পরিবর্তন আমিই ঘটিয়েছি বলে ওর বিশ্বাস। মিথ্যেও নয়, আমিই অনেকটা দায়ী। সেই জন্যই ওর কাছে আমি আজকাল বিষ। দু'হাতে এত যে টাকা ওড়ায়, গাছগাছালি, আলো, ফার্নিচারে ঘর যে ভর্তি দেখছিস এ সবের কারণ হল কবিতা। কবিতার মেজাজ আনবার জন্য কত কী করে। এমন কি কিছুদিন পরে নাকি বাড়ি ছেড়ে কুটীরে বাস করবে। আবার বলে দশতলার ওপর একটা ফ্ল্যাট কিনবে যেখানে বসে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। কীভাবে কবিতা ওর মনে আসবে তা তো আমি জানি না। কিন্তু এই নিয়েই আমার সঙ্গে যত

অশান্তি। আমার মরতে ইচ্ছে করে রে সিন্ধু।

সিন্ধু বেপরোয়া ভাবে হেসে টেবিল চাপড়ে বলল—দূর! এটা কোনো গোলমালই নয়। তুমি একেবারে আনস্মার্ট। দাঁড়াও সব ঠিক করে দিয়ে যাবো।

এই বলে সিন্ধু উঠে বলল—ঠিকই বলেছো, বেলা যখন হয়ে গেল তখন ভাতটা খেয়েই বেরোই। কিন্তু সকালে যা খাইয়েছো···

—যা পারিস দু'মুঠো খেয়েই যা।

খেতে বসে সিন্ধুকে গনপত বলল—দ্যাখ সিন্ধু, আমি কিন্তু ব্যবসাদার নই তোর মতো। আমাকে বেশী ব্যবসাতে টানবি না, আমি কলকাতায় এসেছি নাটক দেখতে। নট্ট কোম্পানীর 'নটী বিনোদিনী', থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'চাকভাঙা মধু', নান্দীকারের 'তিন পয়সার পালা', থিয়েটার গিল্ডের 'যদুবংশ'—এ ক'টা দেখে যাবোই। পারি তো আরো কয়েকটা। বাগড়া দিবি না। তারপর বৌদির দিকে ফিরে বলল—বৌদি, আপনি যাবেন নাটক দেখতে?

—সিন্ধু যদি যায় তো যেতে পারি। সবাই একসঙ্গে যাবো। কতকাল থিয়েটার সিনেমা দেখি না।

—সিন্ধুটা মাড়োয়ারী হয়ে গেছে বৌদি। আর্ট-ফার্ট বোঝে না, ব্যবসা একটু-আধটু বোঝে। আমি হয়ে গেছি বাঙালী, ব্যবসা মাথায় ঢোকে না, আর্টটা একটু একটু বুঝি।

বৌদি খুব হাসে।

বহুকাল বুঝি এমন হাসেনি।

সিন্ধু বেরোলো অনেক বেলায়, দুপুরের খাওয়াটা বড্ড ভারী হয়ে গিয়েছিল, কমলাও খুসে খুসে খাইয়েছে, খেয়ে উঠে গড়াতে গিয়ে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, দুটো নাগাদ ঘুম ভাঙতেই সিন্ধু তড়বড়িয়ে ওপরে উঠে এল, 'বৌদি, বৌদি' বলে চেঁচাতেই কমলা তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হেসে বলল—ডাকিনি বলে বকবি তো?

—বকবই তো! কত কাজ ছিল, এখন যেতে যেতে সব জায়গার অফিস আওয়ার্স পার হয়ে যাবে।

কমলা বলল—ইচ্ছে করেই ডাকিনি, কি চেহারাটা করেছিস! একটু বিশ্রাম নিলে সারবে ভেবে আর ডাকিনি।

'খুব ভালো করেছো', সিন্ধু রাগ করে বলে—আর গনফটটাকেও আমি পার্টনারশীপ থেকে ভাগাচ্ছি। হারামজাদা খাওয়া আর ঘুম ছাড়া কিছু জানে না দুনিয়ার।

—মোটা মানুষ, ও অত খাটতে পারে নাকি তোর মতো! তাছাড়া ওর তো ভাতকাপড়ের তাড়া নেই!

সিন্ধু মাথা নেড়ে বলে—ঠিকই বলেছো। শালার বাপ ভাই দেখতে পারে না বটে কিন্তু গাড্ডায় পড়লে খরচাপাতি চালিয়ে নেবে, ব্যাটা এখনো দু-পাঁচশো টাকা যখন তখন বের করতে পারে। ওর সুটকেস খুঁজলে কম করেও হাজার দুই-তিন টাকা পাবে। ব্যাটা টাকা ওড়াতেই কলকাতায় এসেছে।

—তুই ওর পিছনে অত লাগিস কেন?

—লাগব না? দেখ গে, এখনো কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে! তিন-চার-জোর ঝাঁকি মেরেছি, গোটা দুই লাথি, সব হজম করে খাদসটা তাকিয়া হয়ে পড়ে আছে।

কমলা এলো চুল পিঠের দিকে সরিয়ে দিয়ে বলল—চা করি? একেবারে চা খেয়ে একটু ঘুরে আয়। কাল থেকে কাজ করিস।

—না, না, আজ একবার বেরোতেই হবে। ছুটি কাটাতে তো আসা নয়, তিনদিন মোট থাকব বলে এসেছি। শিলিগুড়িতেও দু' তিনটে কাজ পড়ে আছে। নষ্ট করার মতো সময় নেই।

—তোরা সবাই এত কাজের হলে আমি কোথায় যাই বল তো! তোর দাদার মুখে কাজ আর কাজ শুনে কাজের ওপর অরুচি ধরে গেল। সিন্ধু, যদি কখনো খুব কাজের মানুষ হয়ে উঠিস তাহলে বিয়ে করিস না। বিয়ে করে পরের মেয়েকে একঘরের মতো করে রাখার মানে হয় না।

—বিয়ে! সিন্ধু হেসে বলে—কি ভাবো তুমি বলো তো বৌদি! এ জন্মে বিয়ে-টিয়ে আর হল না। আমার জন্য বৌয়ের কোনো প্রভিশনই নেই, অ্যালটমেন্ট হয়নি।

কমলা হাসল। তারপর রান্নাঘরে ঢুকল চা করতে।

সেই ফাঁকে সিন্ধু একটু এঘর ওঘর করে। দাদার লেখার ঘরে ঢুকে সে খুব নিবিষ্টভাবে চারধার দেখে। দেখে অসম্ভব অবাক হয়। দাদা যে কত টাকা আয় করে তার কোনো হিসেব করতে পারে না সে। চারটে দেয়াল চার রঙে এনামেল করা। কি বিপুল দামের একটা খাট! খাটের এক ধারে অ্যাকুয়ারিয়াম ফিট করা, তাতে শ্যাওলা রয়েছে, স্পঞ্জ রয়েছে, একটা পাথরের ব্যাঙ বসে আছে একধারে, এক-একবার তার মুখটা হাঁ হচ্ছে আর একটা করে বাতাসের গোলা মুখ থেকে বেরিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। কাচের ভিতরে নানা রঙের আলোয় দামী মাছেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্যধারে দাদার লেখার টেবিল। টেবিল বটে, তবে তা সাধারণ টেবিল নয়। সম্ভবত মহার্ঘ্য। বার্মা সেগুন দিয়ে তৈরি। আয়নার মতো ঝকমকে অর্ধচন্দ্রাকার বিশাল সেক্রেটারিয়েট, তার ওপর টেবিলবাতি, ছাইদানি, কাগজের প্যাড, কলম, সিগারেট সব কিছুই যেন বিদেশের গন্ধমাখা। কি বিশাল অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়ের তৈরি টেবিলবাতি, পার্কার পঁচাত্তর, লাইফ-টাইম শেফার, মন্ট ব্লাঁ, চৌদ্দ ক্যারেট সোনার পাইলট, পেলিক্যান—এইসব দামী কলম একটা হাতির দাঁতের কৌটায় খাড়া করে রাখা আছে। দাদার লেখার টেবিলের চেয়ারটা রিভলভিং। সিন্ধু বসে দেখল কোনো শব্দ হয় না। কাৎ হয়ে, চিৎ হয়ে, ঝুল খেয়ে দেখল, চেয়ারটা সব দিকে অনায়াসে হেলে যায়। টেবিলের ডানদিকে সবচেয়ে তলার ড্রয়ারটা আধইঞ্চি খোলা ছিল, সিন্ধু সেটা টেনে আর একটু খুলল কৌতূহলবশে, এবং ব্ল্যাক নাইটের বোতলটা দেখতে পেল। বুকটা ধক্ করে ওঠে তার। বোতলটা তুলে এনে দেখে, তলানি দু'ইঞ্চি পরিমাণ হুইস্কি এখনো আছে। মদ খাওয়া খুব

খারাপ বলে কোনো সংস্কার নেই সিন্ধুর। তবু দাদা এসব আগে খেত না, এটুকু সে জানে। খুব আদর্শবাদী, একটু গোঁড়া আর দৃঢ়চেতা লোক ছিল দাদা।

বোতলটা সাবধানে যথাস্থানে রেখে সিন্ধু আবার চারধারে চেয়ে দেখে। দেয়ালে অনেকগুলো তেলরঙের ছবি, কয়েকটা জল রঙে আঁকা। উঠে ঘুরে ঘুরে সে ছবিগুলো দেখল। ছবির ফ্রেমে দাদা আবার ছোট্ট কার্ড এঁটে রেখেছে, তাতে আর্টিস্টদের নাম। যামিনী রায়, হোসেন, গণেশ পাইন, গুজরাল, সুনীল দাস এরকম প্রায় আট-দশটা ভারতের বিখ্যাত চিত্রকরদের আঁকা আধুনিক ছবি। ছবির দাম সম্পর্কে যেটুকু ধারণা আছে সিন্ধুর তাতে সে আন্দাজ করল, ছবিগুলোর মোট দাম বারো থেকে পনেরো হাজার টাকা হবে। বেশীও হতে পারে। ছবির ফাঁকে ফাঁকে বিশাল সব বুক কেস ভর্তি বই। নতুন বা চকচকে বই সব, এখনো অনেক বই ভাল করে বোধহয় খোলাও হয়নি। মেঝের খাট থেকে দরজা অবধি একটুকরো আসল পশমের কার্পেট পাতা। টমেটো রঙের কার্পেটটার গায়ে বিলিতি কুকুরের মতো লম্বা নরম লোম। খুব কম করেও ঐ এক টুকরো কার্পেটের দাম হাজার দুয়েক হবে।

কেন? এসব কেন? এত ঐশ্বর্য দাদার কবে থেকে হল? এসব প্রশ্নের কোনো জবাব সিন্ধু জানে না। শুধু এইটুকু জানে, এত টাকা এত অল্পসময়ে কখনোই খুব সাদামাটা উপায়ে হয় না। সিন্ধু নিজেও চাকরি না পেয়ে ব্যবসা করছে। সে জানে, ব্যবসা করতে গেলে একদম সৎ থাকা যায় না। অন্ততঃ এদেশে সৎ ব্যবসায়ীদের ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। সে নিজেও কত সময়ে কত অসৎ উপায় নিয়েছে, কিন্তু দাদার এই বড়লোক হওয়ার ব্যাপারটায় কোথায় যেন একটা সৃষ্টিছাড়া কিছু আছে।

সিন্ধু দাদার টেবিলের টানাগুলো খুলে খুলে দেখল একটু, প্রায় সব কটাই চাবি দেওয়া। মোট তিনটে ড্রয়ার খোলা গেল। একটায় কয়েক বোতল বিদেশী মদ দেখতে পেল। অন্যটায় দাদার

পুরোনো সব কবিতার ফাইল কপি, কবিতা মুসাবিদা করা খুচরো কাগজের ডাঁই, আর সেই সঙ্গে প্রায় আট-দশ প্যাকেট কেন্‌ট্‌, রথম্যান, ডানাহিল, প্লেয়ার্স্‌ থ্রি, বেনসন অ্যাণ্ড হেজেস, আবদাল্লা, ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট—এইসব সিগারেটের প্যাকেট দেখতে পেল, এক প্যাকেট ফাইভ ফিফ্‌টি ফাইভ খোলা ছিল। তা থেকে একটা ধরিয়ে সিন্ধু আপনমনেই নিজেকে প্রশ্ন করল—আচ্ছা সিন্ধু, দাদাকে কি তোমার হিংসে হয় ?

অনেক ভেবে সে নিজেই উত্তর দিল—না তো, হচ্ছে না।

—তাহলে কি হচ্ছে বলো তো ! দাদার এই অসম্ভব বড়লোকী দেখে কিছু প্রতিক্রিয়া হচ্ছে নাকি মনে ?

—হচ্ছে।

—কি সেটা ?

—দাদার জন্য বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

বৌদি ডাকল—সিন্ধু, কোথায় গেলি ? গনপতিকে নিয়ে আয়।

সিন্ধু উঠে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। বৌদি ডাইনিং হল থেকে তার দিকে চেয়ে ছিল। একটু যেন কেমন বৌদির তাকানো। মুখটা সরিয়ে নিয়ে বলল—দাদার ঘর দেখছিলি ?

—হ্যাঁ।

বৌদি একটা চাপা স্বরে বলল—ও ঘর কিন্তু আমার নয়। আমি ওটায় থাকি না।

—তুমি কোথায় থাকো ?

—পাশের ঘরে, ছেলেমেয়ের সঙ্গে। আমরা দু'ভাগ হয়ে গেছি।

—কবে থেকে ?

—চা খা সিন্ধু, গনপতিকে ডাক।

॥ পাঁচ ॥

আজও স্কুলে গিয়েছিল সাগর। ক্লাস-টাস নিল না, হাজিরা খাতায় সই করে সোজা হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরে গিয়ে বলল—একটু কাজ আছে, যাচ্ছি।

হেডমাস্টার মশাই খুব বিনয়ের সঙ্গে বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওজন্য বলার কি?

বলে হেডমাস্টার মশাই একটু চোখের ইশারা করলেন। সাগর ইশারাটা ধরে একটা চেয়ার টেনে বসল। মর্নিংয়ের গার্লস্ সেকশনের হেডমিস্ট্রেস এখনো যাননি, মস্ত একটা খাতা খুলে কি যেন দেখছিলেন। একবার চোখ তুলে সাগরকে দেখলেন, একটু হাসলেনও, উনি উঠে না গেলে ঘরটা ফাঁকা হয় না। আর ফাঁকা না পেলে হেডমাস্টার মশাই সাগরের সঙ্গে গোপন কথাটাও বলতে পারেন না। সাগর অবস্থাটা একটু ভেবে দেখল। মজুমদারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বারোটায়। ঘড়িতে এখন এগারোটা পাঁচ। ট্যাক্সিতে গেলে মিনিট দশেক সময় লাগবে কর্পোরেশন বিল্ডিংয়ে পৌছোতে। একটু সময় হাতে করেই যাওয়ার ইচ্ছে সাগরের। মজুমদার কাল স্কচ খাইয়েছে। অনেক খোলামেলা ব্যক্তিগত কথা বলেছে, বন্ধুত্ব অর্জনের চেষ্টা করেছে, তবু সাগর জানে যে মজুমদার লোক ভাল নয়। প্যাক্টের টাকা শেষ পর্যন্ত পুরো দিতে চাইবে না। মানিকটাও হাঁদারাম, হয়তো বিশ্বাস করে টেণ্ডারটা আনবেই না। নগদ দশ হাজার টাকা মুফতে পাওয়ার লোভে নয়, সাগরের কোথাও হেরে যেতে ইচ্ছে করে না। তার হারের জীবন শেষ হয়ে গেছে। এখন কেবল জয় আর জয়।

হেডমিস্ট্রেস নন্দিতা দাশগুপ্তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, বিয়ে-থা করেননি। সাগর শুনেছে, ভাইদের সংসারে থাকেন। দেখতে খারাপ ছিলেন না, কিন্তু এখন মুখশ্রীতে কেমন এক কুটিলতা

এবং ক্লান্তির ছাপ পড়েছে। খাতাখানা রেখে সাগরের দিকে চেয়ে বললেন—আপনি তো শুনি বড় কন্ট্রাক্টর; আমার একটা ভাইপোকে চাকরি দেবেন? খুব ভালো স্বভাবের ছেলে।

সাগর গম্ভীর হয়ে রইল, এসব সময়ে ফ্যাক করে হেসে ফেলতে নেই। ভ্রূটা একটু তুলে বলল কোয়ালিফিকেশন কি?

—বি. এ পাস।

সাগর এবার খুব ক্ষীণ একটু হেসে বলে - বি. এ. পাস ছেলেতে দেশ ভরে আছে কোনো টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশন নেই?

—না তো। ওর বরাবরই আর্টসে মাথা, ইংরিজিতে বেশ ভাল। দশটা নম্বরের জন্য ডিস্টিংশন পায়নি।

সাগর তেমনি ভ্রূ তুলে বলল—অনার্স নেয়নি কেন?

— ইংরিজিতে নিয়েছিল। পরীক্ষার আগে ছেড়ে দিল—ওর চোখটা খারাপ, তাই আমিই ছাড়িয়েছি অনার্স। খুব পড়তে হয় তো—একটু দেখবেন তো ভাই। ঐ ছেলেটার একটা গতি হলে স্বস্তি পাই। ওর আবার মা নেই, আমিই পালছি পুষছি।

সাগর মাথা নেড়ে বলল—দেখব।

—একদিন আপনার অফিসে পাঠিয়ে দেবো?

—দেবেন।

হেডমিস্ট্রেস উঠে যান।

হেডমাস্টার মশাই সাগরের দিকে একটু ঝুঁকে বলেন—লাস্ট মিটিঙে ম্যানেজিং কমিটিতে আপনার বিষয়ে কথা উঠেছিল।

সাগর অবাক হয়ে বলে—কি কথা?

উনি ঈষৎ ম্লান হেসে বলেন—এই আপনার ক্ষেত্রে ক্লাস অ্যালটমেণ্ট কম কেন, গত বছর কেন আপনার প্রায় তিরিশ দিন উইদাউট পে হল, পরীক্ষার খাতা আপনি কেন দেখেন না, এইসব।

সাগর গম্ভীর হয়ে রইল। এটা সে আশা করেনি। সে জানে, এই স্কুল তার কাছে নানাভাবে ঋণী।

—আপনি কি বললেন? সাগর জিজ্ঞেস করে।

হেডমাস্টার মশাই বিনয়ের সঙ্গে বলেন—আমি যথাসাধ্য ডিফেণ্ড করেছি। কিন্তু টিচার্স রিপ্রেজেনটেটিভরাই তো আপনার বিরুদ্ধে। এজেণ্ডাতে আপনার প্রসঙ্গ ছিল না। স্কুলের নানা প্রবলেমের কথায় ওঁরা আপনার কথা তুললেন। বিশেষ করে হিমাদ্রিবাবু খুব ড্যামেজিং কথাবার্তা বলছিলেন।

ও। বলে সাগর একটু ভাবে। হিমাদ্রি ঘোষই শিক্ষকদের মধ্যে একমাত্র লোক যে কখনো সাগরের কাছ থেকে টাকা ধার চায়নি। অল্পবয়সী হিমাদ্রি ঘোষ একটু ঠোঁটকাটাও বটে, একজন মস্ত ট্রেড ইউনিয়নিস্টের ছেলে। বাড়ির অবস্থা ভাল। ছাত্রমহলে বেশ জনপ্রিয়। অবশ্য সাগরের তাতে কিছু যায় আসে না। হিমাদ্রিকে গ্রাহ্য করার তেমন কোনো কারণ নেই। তবু বছরের প্রথমে যখন রুটিন টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন ঐ হিমাদ্রিই সবচেয়ে বেশী চেঁচামেচি করেছিল বিভিন্ন শিক্ষকের ক্লাসের সংখ্যার সঙ্গে সাগরের চূড়ান্ত অসাম্য দেখে। কিন্তু হিমাদ্রি ছাড়া আর কেউ চেঁচামেচি করেনি। কারণ, সবাই সাগরের অধমর্ণ। আর এ কথাও সবাই জানে যে, সাগরের ধার শোধ না দিলেও কোনো ক্ষতি নেই, সাগর ধার দিয়ে ভুলে যায়।

হেডমাস্টার মশাই বললেন—অবশ্য ব্যাপারটা বেশীদূর গড়ায়নি। কমিটির প্রেসিডেণ্ট নিজেই বললেন—আমরা সাগরবাবুর কাছে নানাভাবে ইনডেটেড। আমাদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের ডেফিসিট এখনো পঞ্চান্ন হাজার টাকা, ইলেকট্রিক বিল প্রায় দু হাজার বাকী পড়েছে, স্কুল এখন র‍্যানিং থ্রু ক্রাইসিস। এরকম অবস্থায় সাগরবাবু আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন। সুতরাং তাঁর কেসটা আমরা কনসিডার করব।

সাগর চুপ করে রইল। বুকটা জ্বালা করে। কোথায় যেন একটা হার হয়ে যাচ্ছে।

হেডমাস্টার মশাই বললেন—অবশ্য এতে কমিটির সবাই খুব খুশী হয়নি। গার্জিয়ানরা জয়েণ্ট পিটিশন করবে আপনার বিরুদ্ধে,

এমন কথাও হিমাদ্রিবাবু বলছিলেন। অলোকবাবুও সাপোর্ট করছিলেন।

অলোক হল আর একজন শিক্ষক প্রতিনিধি। ছেলেটার ব্যক্তিত্ব নেই, বড্ড বেশী কথা বলে, এবং অধিকাংশই মিথ্যে কথা। অলোক ঘোষাল অবশ্য সাগরের কাছ থেকে ধার নেয়, সিগারেট চেয়ে খায়। তবু ওকে বিশ্বাস করা যায় না।

দেরি হয়ে যাচ্ছে। সাগর উঠে দাঁড়িয়ে বলল—ঠিক আছে, আমি না হয় রিজাইন করব।

হেডমাস্টার মশাই একটু চমকে উঠে বলেন—কি বলছেন? আপনার রিজাইন করবার কথাই তো ওঠে না। হিমাদ্রি বা অলোককে কেউ সাপোর্ট করছি না আমরা। সব টিচারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সবাই আপনার পক্ষে। শুধু পরিস্থিতিটা আপনাকে জানিয়ে রাখলাম।

মনে মনে সাগর যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছিল; স্কুলের চাকরিটা নিয়ে তার বিশেষ মাথাব্যথা নেই। উপরন্তু একটা জরুরী কাজে যাওয়ার সময়ে এইসব গোলমালের কথা মনটাকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। বিরক্তিটা বজায় রেখেই সে একটু রুক্ষ গলায় বলল—আমি স্কুলকে যথেষ্ট কাজ দিই না এ তো সবাই জানে। আমার চাকরি ছেড়ে দেওয়া অনেক আগেই উচিত ছিল। আমি কালই রেজিগনেশন লেটার দেব।

হেডমাস্টার মশাই একটু বিব্রত হয়ে পড়েন। বলেন—আপনি বসুন। আমি ব্যাপারটা আপনাকে আর একটু খুলে বলি। আপনার রাগ করার মতো কথা নয়। হিমাদ্রির অ্যাটিচুড আমরা কেউ সাপোর্ট করছি না।

সাগর তার ওমেগা হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল—আজ তো সময় নেই। কাল-পরশু বরং ব্যাপারটা শুনে নেবো। হিমাদ্রির সঙ্গেও একটু কথা বলা দরকার। আমি শুনেছিলাম এর মধ্যে ছাত্ররা কবে যেন একটা জয়েন্ট পিটিশন করেছিল আপনার কাছে

তাতে আমার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ ছিল।

হেডমাস্টার মশাই একটু অপ্রতিভ হেসে বলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তবে সেই দরখাস্ত তো চেপে দেওয়া হয়েছে, আপনার বিব্রত হওয়ার কারণ নেই। আমি সিগনেটোরিদের ডেকে পাঠিয়েছিলাম। এক একজন করে ইণ্টারভিউ নিই। ওরা তাতে খুব ভয় পেয়ে প্রত্যেকেই স্বীকার করেছে যে ওরা নিজের থেকে দরখাস্ত করেনি। হিমাদ্রি আর অলোকই ওদের দরখাস্ত করতে ইনস্টিগেট করে। আপনার বিরুদ্ধে ছাত্রদের কারোই কোনো ব্যক্তিগত অভিযোগ নেই!

সাগর গম্ভীরমুখে বলে—দরখাস্তটা চেপে দিয়ে আপনি ভাল কাজ করেননি। আমাকে তখনই যদি জানাতেন তাহলে আমি নিজের অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক হতে পারতাম।

হেডমাস্টার মশাই মাথা নেড়ে বললেন—এসব নেগলিজিব্‌ল্ ব্যাপার নিয়ে থামোকা আপনি ভাবছেন। আমার প্রায় ত্রিশ বছরের সার্ভিস লাইফে এর চেয়ে কত বেশী সিরিয়াস ঘটনা ঘটেছে। আমি বরং হিমাদ্রি আর অলোকের সঙ্গে আজই একবার কথা বলব।

সাগর উদাস গলায় বলল—বলবেন, দেখা হলে আমিও বলব। তবে কারো বিরাগভাজন হয়ে থাকার ইচ্ছে আমার নেই।

হেডমাস্টার মশাই খুব আন্তরিকভাবে বলেন—আরে না, না। আপনি ওসব নিয়ে ভাববেন না। প্রেসিডেণ্ট আপনার পক্ষে, আর আমিই তো সেক্রেটারী। আপনার কোনো চিন্তা নেই। আমরা তো জানি, আপনার স্কুলের চাকরির কোনো দরকারই পড়ে না। বরং স্কুলের প্রতি মমতাবশেই আপনি আছেন এখনো। আপনার ওপর স্কুল অনেকটা ডিপেণ্ড করছে।

সাগর একটা অনিশ্চিত 'আচ্ছা' বলে চিন্তিত ভাবে বেরিয়ে এল। সে হিমাদ্রি বা চাকরিটার কথা ভাবছিল না, এমন কি সে মজুমদারের কথাও ক্ষণেক ভুলে গেল। সিঁড়ি দিয়ে ফুটপাথে নামতেই আজও সে হিলিয়াম বেলুনটিকে দেখতে পেল। থমথমে বাতাসে বেলুনটা

বেশ সোজা দাঁড়িয়ে আছে। সেই দিকে চেয়ে আবার তার দীর্ঘ খোয়াই……মনে পড়ে।

ফুটপাথে নেমে দাঁড়াতেই বেয়ারা ভানু তাড়াতাড়ি বারান্দা থেকে নেমে বলে—ট্যাক্সি তো! আপনি বসুন গিয়ে ঘরে, আমি ডেকে আনছি।

সাগর তার ঘড়ি দেখে বলে—একটু তাড়াতাড়ি আনিস। সময় কম।

ভানু জোর কদমে বড় রাস্তার দিকে গেল। সাগর এদের প্রায় কিনে ফেলেছে। অজস্র বকশিশ পেয়ে এরা এখন সাগরেরই কথা শোনে, অন্য মাস্টার মশাইদের তেমন মানতে চায় না।

সাগর রিচার্স্ রুমে এসে বসল। ঘরটা ফাঁকাই প্রায়। সবাই ক্লাসে গেছে। শুধু বুড়ো সুবোধবাবু আপনমনে খৈনী বানাচ্ছেন। গত বছরও সিগারেট খেতেন, এ বছর বাজেটে সিগারেটের দাম বাড়ায় খৈনী খাচ্ছেন আজকাল। সাগর বসে বাংলা খবরের কাগজটা তুলে নিল। খবরের কাগজ দেখার সময় তার বড় একটা হয় না, ইচ্ছেও করে না, তবু নিল, কাগজের দিকে চেয়ে থেকেই তার মনে হল, আজ টিচার্স রুমটা বড় বেশী ফাঁকা। এত ফাঁকা হওয়ার কথা নয়। সবাই ক্লাসে গেলেও বাড়তি অন্ততঃ পাঁচজনের থাকার কথা, বোধহয় আজ অনেকেই অ্যাবসেন্ট।

সাগর যখন কবি ছিল, যখন তার ব্যবসা এত বড় হয়নি, তখন এই স্কুলে তাকে প্রচুর প্রভিশনাল ক্লাস করতে হয়েছে। রুটিনেও তার সপ্তাহে বত্রিশ-তেত্রিশটা করে ক্লাস থাকত। দিনে সাত পিরিয়ডে সাতটা ক্লাস করে গলা ভার হয়ে উঠত, শরীর বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ত, আজ চারজন অ্যাবসেন্ট, তবু সাগর আজ একটাও ক্লাস না নিয়ে চলে যেতে পারে কত অনায়াসে। আগের দিনে পারত না। এখন তার বদলে অন্যেরা প্রভিশনাল ক্লাস করে মরে।

খবরের কাগজের দানা অক্ষরগুলির দিকে চেয়ে ছিল সাগর, কিছু দেখছে না। ভাবছে। স্কুলটা তার এখন নৈতিক দিক থেকে

ছেড়ে দেওয়াই উচিত। খামোকা সে একটা চাকরি আটকে বসে আছে। বোধহয় এই কারণেই হিমাদ্রি বা অলোক তাকে ভাল চোখে দেখে না। সে অবশ্য কলিগদের কারো প্রতিই তেমন মনোযোগ দেয় না আজকাল। কোনোদিনই দেয়নি। যখন কবিতা লিখত তখন নিজেকে এদের চেয়ে অনেক বেশী স্পর্শকাতর আর বুদ্ধিধর বলে জানত. আজকাল সে ভাবে, এরা খুবই তুচ্ছ, অস্তিত্বের লড়াই এদের সপ্রতিভতা কেড়ে নিচ্ছে। এদের পাত্তা না দিলেই হয়। কিন্তু আজ সে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম করে ভাববার চেষ্টা করল।

একটা অত্যন্ত খর পদশব্দে চোখ তুলেই সাগর হিমাদ্রিকে দেখতে পেল, ঘরে ঢুকছে। হিমাদ্রি বেঁটে, রোগা, কালো। চেহারা সাধারণ, তবু ওর চোখেমুখে একটা তুখোর ভাব আছে। বড্ড বেশী কথা বলার অভ্যাস, ওকে দেখেই সাগরের বুকটা নড়ে ওঠে একটু। আজ একটু অন্য চোখে দেখল হিমাদ্রিকে। প্রায়দিনই কথা বলে না, আজ হিমাদ্রি ঘরে ঢুকে সই করার খাতা খুঁজছে দেখে সাগর নিজের ঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল—এগারোটা একত্রিশ হিমাদ্রিবাবু।

হিমাদ্রি সাগরের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল—একটু দেরি হয়ে গেল।

সাগর অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় বলে—তাই দেখছি। লাস্ট রিজোলিউশানে আমরা প্রস্তাব নিয়েছিলাম যে এগারোটা ত্রিশের পর অ্যাটেণ্ডেন্স্ চলবে না।

হিমাদ্রি একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে—এই স্কুলে সবই চলে। ক্লাস না করেও অ্যাটেণ্ডেন্স্ হয়। দেখছি তো।

সাগর রেগে যায় না, শুধু মৃদু হাসি সহকারে দাবার আর একটা চাল দেয় মাত্র। বলে—খাতা হেডমাস্টারর্স রুমে চলে গেছে। যান, গিয়ে সই করুন। উনি যদি সই করতে দেন তাহলে আমার আপত্তি কি? কিন্তু আমার পরামর্শ হল, আজ

আর সই না করে বাড়ি চলে যাওয়াই ভাল।

হিমাদ্রি বোধহয় একটু সামান্য মাত্র পিছিয়ে যায় মনে মনে। তবু হালকা চালে বলে—আপনার ঘড়িটাই যে ঠিক তা কে বলল?

সাগর বাঁ হাতের কব্জিটা এগিয়ে দিয়ে বলে ওমেগা ক্রোনোমিটার, বাইশশো টাকায় কেনা। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুযায়ী আজ সকালেও রেডিওর টাইম সিগন্যালের সঙ্গে কাঁটায় কাঁটায় মিলেছে।

হিমাদ্রি সাগরের উল্টোদিকের চেয়ারে বসে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরায়। তারপর বলে—ঠিক আছে, আজ না হয় সই না করলাম, আমার ক্যাজুয়াল লিভ এখনো সাতদিন পাওনা আছে।

সাগর মাথা নেড়ে বলে– আমার একদিনও পাওনা নেই। আমি বড় বেশী ইররেগুলার, আপনার ক্যাজুয়াল লিভগুলোকে আমার হিংসে হয়, কয়েকটা ধার দেবেন?

হিমাদ্রি সাগরের চোখে চোখ রেখে লড়াই বুঝতে পেরে বলে—আপনার ধার নেওয়ার দরকার কি? ম্যানেজমেণ্ট তো আপনার সব ছুটিই দরখাস্ত ছাড়াই গ্র্যাণ্ট করছে। আমরা কেউই আপনার মতো ভাগ্যবান নই।

সুবোধবাবু খৈনীর থুথু ফেলে এলেন। চেয়ার টেনে বসবার আগেই হিমাদ্রির কাঁধে চাপড় মেরে বললেন—হিমাদ্রিবাবু, কাজটা ভাল করেননি, লাস্ট মিটিঙের খবর আমরা পেয়েছি, টিচার্স রিপ্রেজেণ্টেটি ভরা তাদের কলিগের বিরুদ্ধে বলবে, এটা ঠিক না। সাগরবাবুর কেসটা মিটিঙে ডিসকাস করা উচিত হয়নি।

হিমাদ্রি একটু থমকে গেল। তারপর বলল—কারো বিরুদ্ধে বলা তো আমার উদ্দেশ্য ছিল না। স্কুলের ওয়েলফেয়ার দেখতে গেলে এসব ব্যাপার তুলতেই হয়। আমার ব্যক্তিগত আক্রোশ নেই।

ভানু এসে গেছে। দরজার ফাঁক দিয়ে ফুটপাথের কাছ ঘেঁষে ট্যাক্সি দাঁড়ানো দেখে সাগর উঠল। খুব সাদামাটা ভাবে হিমাদ্রির

উদ্দেশ্যে বলল—আপনার তো স্কুল করা হল না। চলুন, আপনাকে একটু এগিয়ে দিই। আমি কর্পোরেশনে যাবো।

হিমাদ্রি একটু ইতস্তত করে হঠাৎ খুব স্পোর্টস্‌ম্যানশিপ দেখিয়ে উঠে বলল—চলুন, বড়লোকদের সঙ্গ করা ভাল।

কামড়টা গায়ে মাখল না সাগর। ট্যাক্সির কাছে এসে আগে হিমাদ্রিকে উঠতে দিয়ে পরে নিজে উঠল। এক প্যাকেট বিদেশী সিগারেট ছিল পকেটে। নতুন প্যাকেটটা বের করে সেলোফেনের মোড়ক খুলে এগিয়ে দিল হিমাদ্রির দিকে। গ্যাসলাইটারে ধরিয়ে দিল। ট্যাক্সি হাজরা ছাড়িয়ে যাওয়ার সময়ে প্রথম কথা বলল—যাবেন নাকি আমার সঙ্গে? কি ভাবে টাকা রোজগার করতে হয় দেখে আসবেন!

বলে হাসল সাগর।

হিমাদ্রিও হাসে। বলে—আপনি খুব মাইণ্ড করেছেন বোধহয়? মিটিঙে কথাটা আমি কিন্তু খুব ক্যাজুয়ালি তুলেছিলাম।

সাগর যেন সে কথায় কান দিল না। উইণ্ড স্ক্রিন দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ আস্তে করে বলল—আমি একজন খুব অসুখী মানুষ। জানেন? খুব আনসাকসেসফুল।

সাগর কথাটা সাজিয়ে বা বানিয়ে বলেনি, এমনি হঠাৎ যেন তার হৃদয় কথা বলে উঠল। তার খুব একটা ভাবপ্রবণতা নেই, এমন কি সমব্যথী বা সংবেদনশীল মানুষও তার আজকাল আর দরকার হয় না। তবু তার হৃদয় থেকে কথাটা উঠে এল।

হিমাদ্রি একটু ফচ্‌কে হাসি হেসে বলে—আপনি যদি আনসাকসেসফুল তবে তো আমরা কোন গভীর গাড্ডায় পড়ে আছি। আর কি চান বলুন তো দাদা, বাড়ি হাঁকড়েছেন, গাড়ি দাবড়াচ্ছেন, ভাল ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স, আর কি চাই!

সাগর গম্ভীর হয়ে রইল। বা ঠিক গম্ভীর নয়, যেন বড় চিন্তায় ক্লিষ্ট, অন্যমনস্ক। অনেকক্ষণ বাদে বলল—আমার ব্যর্থতাটা কেউ বোঝে না। সাকসেস বলতে লোকে আজকাল বাড়ি-গাড়ি বোঝে।

এটাই একটা প্যারাডক্স।

—তাহলে সাকসেস বলতে আপনি কি বোঝেন?

সাগর একটু ভেবে বলে—ধরুন একজন লোক একটা মাটির পুতুল তৈরী করছে। পুতুলটার বাজারদর সে জানে না, কিন্তু অনেক যত্নে অনেক পরিশ্রমে সে ঠিক যেমনটি চেয়েছিল তেমনটিই তৈরী করতে পেরেছে। তার কাজ শেষ হওয়ায় তার এক দীর্ঘ পরিশ্রমের ক্লান্তির সঙ্গে এক অদ্ভুত তৃপ্তিতে যখন তার মন কানায় কানায় ভরা সেই সময়টুকুই তার সাকসেস, এরপর পুতুলটা লক্ষ টাকায় বিক্রি হল না দু পয়সায় তা নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই।

—ওঃ! বলে হিমাদ্রি সেই ফচ্‌কে হাসি হেসে বলে—এসব তো রবি ঠাকুর অনেক আগেই বলে গেছেন। ওসব তো শিল্প-টিল্পর কথা। দেশের বারো আনা লোকেরই ওসবের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। আমরা পেটের চিন্তা থেকেই সাফল্য আর অসাফল্য বিচার করতে শিখেছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না আপনার অসাফল্য কোথায়।

—ঐখানেই। ও ঠিক আপনাকে বোঝাতে পারব না।

—আপনি কি কবিতার কথা চিন্তা করে বলছেন?

সাগর মাথা নাড়ল · হ্যাঁ।

—ধুস্! হিমাদ্রি বলে—কবিতা দিয়ে কি হয়? আমাকে লক্ষ টাকা দিয়ে দেখুন, সব ছেড়ে দিতে রাজী আছি। এমন কি প্রেমিকা বা সিগারেট—যা ছাড়তে বলুন। আমি কিন্তু জগুবাজারের কাছে নেমে যাবো দাদা।

সাগর খুব হাসছিল। ড্রাইভারের কাঁধে মৃদু চাপড় দিয়ে বলল —ভাই সামনে রাখবেন একটু।

জগুবাজারের কাছে হিমাদ্রি নেমে গেল। বাকি পথটুকু সাগর একা, গম্ভীর।

কর্পোরেশনের গেট-এর কাছেই মানিক দাঁড়িয়ে ছিল। বারোটা বাজতে আর পনেরো মিনিট বাকি। সাগর নামতে নামতেই জিজ্ঞেস

করল—কি রে ? মজুমদার আসেনি ?

রোগা লম্বা আর ফর্সা মানিককে দেখেই বোঝা যায় যে ও খুব ছটফটে স্বভাবের ছেলে। মুখশ্রী খুব সুন্দর। একমাথা চুল। বড় জুলপি আর ঝোলানো গোঁফ দিয়ে অবশ্য চেহারাটা ঢেকে রেখেছে. চোখে কালো চশমা, গায়ে হলুদ আর টকটকে লাল রঙের ডোরাওলা জামা, পরনে খয়েরী আর বেগুনী চেকওলা বেলবটস, পায়ে উঁচু হিলওলা চীনেবাড়ির জুতো, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি কে বলবে! দু-চারটে চুল আর গোঁফ পেকেছে, শুকনো কলপ দিয়ে সে সব ঢেকে চেপে রাখে। ওর একটা দারুন সুন্দরী বৌ আছে। মানিক নিজে বড়লোকের ছেলে, বৌও বড়লোকের মেয়ে। কিন্তু বৌকে বাগে রাখতে পারে না একদম। ওর বৌ ছবি সিনেমায় যায়, মার্কেটিংয়ে যায়, এগজিবিশন দেখে বেড়ায়, নয়তো বাপের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে পুরী, ওয়ালটেয়ার, সিমলা ঘুরে আসে। এবং এসব ব্যাপারে মানিকের মতামতের তোয়াক্কা করে না। অর্থাৎ, মানিক তার বৌয়ের কাছে নিজের ব্যক্তিত্ব রাখতে শেখেনি। বরং এখন বৌয়ের পক্ষ টেনেই ওকালতি করে। সাগর একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল—কি রে, বৌ তোকে একা রেখে দেরাদুন চলে গেল! মানিক খুব সমবেদনার সঙ্গে বলল—হ্যাঁ, আমিই যেতে বলেছি। সারাদিন আমি কাজকর্ম নিয়ে থাকি, ও খুব লোনলি ফিল করে তো। ব্যবসাতেও মানিকের বুদ্ধি কম, দায়িত্বসচেতনতাও তেমন নেই। প্রায় সময়েই ও মানুষকে কথা দিয়ে কথা রাখে না, পেমেন্ট বাকি রাখে, বড় অর্ডার পেলেও গা করে না। তার কারণ, ওর বাবার অনেক টাকা এবং ওর খাওয়াপরার অভাব নেই, কিছু করতে হয় বলে ব্যবসা করতে শুরু করেছিল। যখন অনেক টাকা লোকসান খেয়ে ব্যবসা গোটাতে বসেছে তখনই একদিন সাগরকে বলেছিল—আমি ব্যবসাটা ছেড়ে দিচ্ছি, তুই পারলে কর। সাগর তখন শক্তহাতে ব্যবসার হাল ধরল। সবাই জানে এই ব্যবসাটার সাগরই আসল লোক, মানিক লোক দেখানোর জন্য আছে।

ক্লায়েন্টরা সাগরকেই বেশী চেনে, সাগরের মুখ চেয়েই মহাজনরা মালপত্র দেয়। মানিকও গা ছেড়ে বসে থাকে। তবে সাগরের উদ্যোগ দেখে মানিক ইদানীং কিছু তৎপর হয়েছে। দুজনেই দুজনকে গভীর ভাবে বিশ্বাস করে, ভাল তো বাসেই।

মানিক মাথা চুলকে বলল—বেলা এগারোটায় মজুমদারকে ফোন করেছিলাম। তখনো কনফার্ম করল যে ক্যাশ নিয়ে আসছে। কিন্তু এখনো যে কেন এল না!

সাগর তার স্বাভাবিক শান্ত গলায় বলে—তুই টেণ্ডারটা এনেছিস তো!

মানিক সাগরের চোখের দিকে না তাকিয়ে বলে—ধরকে কাল টেণ্ডার রেডি করতে বলে গেছি। আমি তো আজ আর অফিসে যাইনি, বাড়ি থেকে সোজা আসছি। ধরেরও এখানেই আসার কথা; তো সেও এখনো আসেনি! প্যাক্টের অন্য সবাই ডিপার্টমেণ্টে গিয়ে বসে আছে। বারোটা বাজবার পাঁচ মিনিট থাকতে সবাই টেণ্ডার সাবমিট করবে বলে শুনলাম।

অন্য কেউ হলে এই পরিস্থিতিতে প্রচণ্ড রেগে যেত, চেঁচিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ত। সাগর তা করল না। শুধু একটু বিরক্তির 'হুঁ' বলে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বলল—চল, ডিপার্টমেণ্টে গিয়ে দেখি। মজুমদার হয়তো পিছনের গেট দিয়ে ঢুকে গেছে।

ওরা ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিল, শেষবারের মতো রাস্তাটা দেখে নিতে গিয়ে সাগরই উঁকি দিয়ে দেখে, একটা ট্যাক্সি উল্টোদিকের ফুটপাথের ধার ঘেঁষে থেমেছে, আর ট্যাক্সির জানালা দিয়ে হাত তুলে সাগরকে 'উইশ' করে মজুমদার নেমে আসছে, বাদামী রঙের সুট পরনে, গলায় একটা দারুণ বাহারি আর চওড়া টাই। রাস্তাটা উদ্‌ভ্রান্তের মতো পেরিয়ে এল সে, হাতে একটা পেটমোটা পোর্টমেণ্টো। এধারের ফুটপাথে পা দিয়েই হেঁকে বলল—হ্যালো ভালচারস্, আই হ্যাভ ক্যাম টু বি ইট্‌ন্ বাই ইউ, আর সব কোথায়?

মানিক হাসছিল। বিনা পরিশ্রমে মজুমদারের অনেক টাকা খসানো যাচ্ছে। সাগর একটু গম্ভীর হয়ে গেল। 'ভালচারস' শব্দটা তার ভাল লাগেনি।

মজুমদার কাছে আসতেই অবশ্য বোঝা গেল যে সে আজ মেজাজে আছে। কোন শুঁড়িবাড়ি থেকে কয়েক পাত্র চাপিয়ে এসেছে।

—আজও টেনে এসেছেন মজুমদার? মানিক জিজ্ঞেস করে।

মজুমদার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে—এত টাকার হাস্ মানি কি আর নরমাল অবস্থায় পে করা যায়? হুইস্কি দিয়ে ভিতরটা একটু হুড়-হুড়ে করে নিয়েছি, যাতে দেওয়ার সময়ে মেজাজে থাকতে পারি। আর সব শকুনেরা কোথায়?

—ভিতরে। মানিক উত্তর দেয়।

—অ্যাম আই লেট?

মানিক বলল—একটু।

ঘড়ি দেখে মজুমদার একটা মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে বলে—ইট্স্ জাস্ট দি টাইম।

সাগর ভ্রূ কুঁচকে মজুমদারের দিকে চেয়ে ছিল। মজুমদারকে সঠিক বিশ্বাস নেই। টাকাটা দেবে তো! মানিকটা হাঁদার মতো টেণ্ডারটা সঙ্গে আনেনি। মজুমদার টাকা না দিলেও ওদের টেণ্ডার জমা দেওয়ার উপায় রাখেনি। কণ্ট্রাক্টটা খুবই ভাল। কাজটা করতে পারলে, সাগরের আন্দাজ, লাখ দেড়েক তুলে ফেলা যাবে। কাজটা করারই ইচ্ছে ছিল সাগরের, সে পরিশ্রম দিয়ে রোজগার করতে ভালবাসে। দাঁতে দাঁত দিয়ে, ঘাম ঝরিয়ে লড়াই, আর সেই নিজেকে নিষ্পেষিত করে কাজ দিয়ে পয়সা রোজগার—তার স্বাদই আলাদা, কিন্তু মানিক সব সময়ে ফোকটে রোজগার করতে ভালবাসে, খাটতে চায় না। যে কাজটা সাগর না দেখে তাই গোলমাল হয়ে যায়। আজকে যে রকম টেণ্ডারটা সঙ্গে আনেনি।

সাগর একটু উঁচু গলায় বলল—মজুমদার, আমাদের পেমেন্ট এখানেই হয়ে যাক। বাকিরা ডিপার্টমেণ্টে অপেক্ষা করছে। আমাদের ছেড়ে দিয়ে আপনি ওদের কাছে যান। তাড়াতাড়ি করবেন, দে আর ভেরী মাচ ইগার টু সাবমিট টেণ্ডার………

মজুমদার একটু ভ্যাবলা চোখে সাগরকে দেখল। কোনো কথা বলল না। পোর্টমেণ্টোর মুখ খুলে একটু খুঁজে বেছে একটা বাদামী মোটা খাম বের করে আনল, খামের মুখটা সীল করা। যে ভাবে ভদ্রলোকেরা নাছোড় ভিখিরিদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য দু'দশ নয়া পয়সা তাদের হাতে ফেলে সরে পড়ে, ঠিক সে ভাবেই মানিকের বাড়ানো হাতে খামটা তাচ্ছিল্যভরে ফেলে দিয়ে বলল —হিয়ার ইউ আর। গোনা আছে। নীট দশ।

এই বলে মজুমদার আর তাকালও না। চটপটে পায়ে কর্পোরেশনের বিশাল পুরোনো ফটক দিয়ে ভিতরের আবছা আলোর ভিতরে হারিয়ে গেল।

মানিক বলল—ত্বরে! মাইরি, খুলে দেখব ভিতরে নোট আছে না সাদা কাগজ?

সাগর মাথা নেড়ে বলল—দরকার নেই। খামটা ব্যাগে ঢুকিয়ে নে।

অফিসে এসে সাগর নিস্পৃহভাবে চেয়ারে বসে মা

চোখ বুজে রইল। ওদিকে মানিক আনন্দে আপনমা দের বড় লজ্জা।

'শালা' ধ্বনি দিতে দিতে খামটা ছিঁড়ে একগোছা ল্পবয়সের কালে।

নোট বের করেছে। সাগর একবারও না তাকিয়ে পালিয়ে পালিয়ে

পাচ্ছিল, জিভের জলে আঙুল ভিজিয়ে মানি সঙ্গে কথা বলতে

একশটা একশ টাকার নোট গুনতে বেশী সময় লা তা বলে সবাইকে

সাগর জানে, গুনবার দরকার ছিল না। মজ পায় সে। অন্য যে

কথার খেলাপ করেনি। কথার খেলাপ করার সাহস মজুমদারের আর নেই। ম্যাঙ্গো লেন-এর অফিসের মেইনটেনেন্স, মদিরা, বৌয়ের খোরপোষের টাকা এবং তাছাড়া মজুমদারের নিজের অস্তিত্বের প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কিন্তু 'ভালচারস' কথাটা সাগর কিছুতেই ভুলতে পারছে না। তার কান দুটো গরম হয়ে আছে সেই থেকে, চোখ দুটো টনটন করছে। অপমান টের পেলে সাগরের এ রকম হয়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নতুন নোট, স্টেপল্ করা। মানিক কাগজ কাটা ছুরির ডগা দিয়ে স্টেপলের পিন খুলে টাকা দু'ভাগ করল। সাগরের দিকে একটা ভাগ এগিয়ে দিয়ে বলল—খুব হল আজ, বুঝলি সাগর! মুফৎ টাকা। কি কিনবি?

সাগর টাকাটা ধরল না। টেবিলের ওপর পড়ে রইল। অফিসটা বন্ধ বলে গরম। তাই পাখা চলছে ধীরে। সাগরের ভাগের টাকার গোছা থেকে নোট উড়ু উড়ু করছে। মানিক একটা পেপারওয়েট চাপা দিয়ে বলে—ফেলে রাখিস না, ঢুকিয়ে নে। কে এসে দেখে ফেলবে।

সাগর বিরক্তির সঙ্গে বলল—লোহার আলমারিতে রেখে দে।

—রেখে দেবো! খরচ করবি না?

—কিসের খরচ?

মানিক বোকা হাসি হেসে বলে—এ টাকা তো ওড়াবার জন্য। ·রেখে-টেখে কি হবে? বৌকে বলে এসেছি আজ মার্কেটিংয়ে কাজটা ক·· দেদার ওড়াবো টাকা। এটার তো এন্ট্রি দেখাতে করতে ভালবা·

নিজেকে নিম্পোবিথ খুলল, মানিকের দিকে না চেয়েই বলল—সাধে কি আলাদা, কিন্তু গাঝে আমার লাথি মারতে ইচ্ছে হয়!

ভালবাসে, খাটে করলামটা কি?

ভাই গোলমাল হচ্ছ কবে হবে মান্‌কে? অর্ডারটা ছেড়ে দেওয়ার আনেনি। ·িয়েছিল? দশ হাজার হাস্ মানি পেয়ে লাফাচ্ছিস,

আর অর্ডারটা ধরে কাজ করলে কত লাভ হত জানিস ?

—জানি। কিন্তু তাতে রিস্কও ছিল, খাটুনিও ছিল।

সাগর উঠে পড়ে বলল—বিনা পরিশ্রমে টাকা রোজগার করতে লজ্জা করে না বেলাজা কোথাকার ?

মানিক বেকুবের মতো হাসছিল। হাসিমুখেই বলল—তুই শালা কেমন যেন অন্য রকম! টাকাটা নিয়ে নে। এর পরে না হয় আর এরকম করব না।

সাগর টাকাটা তুলে নিল। একটু ভাবল। 'ভালচারস' কথাটা এই টাকার গায়ে গন্ধের মতো লেগে আছে। মজুমদারের কি খুব কষ্ট হল টাকাটা বের করতে ? কাল ও স্কচ খাইয়েছে।

মানিকের মুড দেখে সাগর বুঝতে পারছিল যে আজ আর কাজ-কর্ম হবে না গানমেটালের বুশগুলোর ব্যবস্থা করতে সাগর বেরিয়ে পড়ে। মনটা বড় খারাপ। টাকা রোজগার করে এত খারাপ কখনো লাগেনি।

॥ সাত ॥

প্রায় এক মাস হয়ে গেল বুকুন কলকাতায় এসেছে চিকিৎসা করাতে।

সিন্ধু মাঝে মাঝে অথৈ জলে পড়ে গিয়ে ভাবে কেন বুকুনের সঙ্গে তার চেনা হল! কেন বুকুনের সঙ্গেই!

ছেলেবেলা থেকেই সিন্ধুর এক রোগ, তার মেয়েদের বড় লজ্জা। সে শুনেছে, তার দাদাও খুব লাজুক ছিল অল্পবয়সের কালে। বাড়িতে অচেনা অতিথি এলে দাদা বাড়ি থেকে পালিয়ে পালিয়ে বাইরে ঘুরে বেড়াত, পাছে অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হয়। দাদার সঙ্গে তার খুব মিল। কিন্তু সিন্ধু তা বলে সবাইকে লজ্জা পায় না। একমাত্র মেয়েদেরই লজ্জা পায় সে। অন্য যে

কোনো মানুষের সঙ্গে যে কোনো পরিবেশে সিন্ধু খুবই অনায়াস। অবশ্য সিন্ধুকে দেখলেও তা বোঝা যায়। বেশ লম্বা, সুন্দর চেহারা। ইদানীং চেহারাটা একটু ভেঙে গেছে। গায়ের বর্ণ তামার মতো পোড়া-পোড়া, হনু আর কণ্ঠার হাড় জেগে থাকে। গাল ভাঙা, চোখের নীচেটা দেবে গেছে অনেক। নানা দুশ্চিন্তা, খাটুনি, অনিশ্চয়তা। তবু তার চেহারার মূল কাঠামোটাই চমৎকার। একটা পৌরুষের ছায়া আছে। তার চোখমুখ খুবই বুদ্ধির আলো বিকিরণ করে। সব মিলিয়ে দেখলে তার চেহারায় মেয়ে পটানোর লক্ষণ আছে। লাজুক বা মুখচোরা ভাবের কোনো চিহ্ন নেই. অবশ্য এখন আর ততটা নয়ও সে আগেকার মতো। তবুও সিন্ধুর এই চেহারাটার ভিতরে ভিতরে আসল সিন্ধুটা লুকিয়ে আছে. তাকে শুধু সিন্ধুই চেনে, আর কেউ নয়।

সেই মেয়ে দেখলেই মুখচোরা সিন্ধু কোনোদিনই মেয়েদের সঙ্গে মেশেনি। বাল্যকাল থেকেই তার কোনো মেয়ের সঙ্গে ভাব হয় না। এক-একজনের একরকম গ্রহের গুণ থাকে। সিন্ধুরও সেই রকম। অথচ এই যৌবন বয়স পর্যন্ত সে খুবই তৃষ্ণার্ত হয়েছিল নারীসঙ্গের জন্য। ঘটেনি কখনো। সে একরকম ভালই ছিল বুঝি। যখন ভাব হল তখন হল বুকুনের সঙ্গে।

বুকুনও—আশ্চর্য—সেই রকমই মেয়ে. যার সঙ্গে সহজে কোনো ছেলের ভাব হয় না। ভারী একটেড়ে নির্জন মেয়ে। সে যে এই পৃথিবীতে জন্মেছে, প্রাণ ধরে বেঁচে আছে, তা জানে মাত্র কয়েকজন। সিন্ধু জানত না।

সেবার জলপাইগুড়ির পলিটেকনিকে মেকানিক্যাল পড়বার সময়ে হোস্টেলের ছেলেদের সঙ্গে শহরের গুণ্ডাদের হাঙ্গামা হল খুব। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের সোস্যাল ফাংশনে বরাবরই শহরের মস্তান ছেলেরা এসে হাঙ্গামা করে, মাতলামির চূড়ান্ত সীমায় চলে যায়। তাছাড়া ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে শহরে আসার দূরত্ব অনেকটা। সেই নির্জন রাস্তায় একা দোকা গেলে হোস্টেলের

ছাত্রদের ভয় দেখিয়ে ছিনতাইও করত মস্তানরা। এটা দীর্ঘকাল চলে আসছিল। হোস্টেলের ছাত্ররা বাইরে থেকে পড়তে গেছে, শহরের মস্তানদের বিরুদ্ধে লাগতে সাহস পেত না। সিন্ধুও শিলিগুড়ি থেকে পড়তে গেছে, হোস্টেলে থাকে। বাবা চাকরি করে তখন, টাকা পাঠায়। সিন্ধু বরাবরই বাবার দুঃখ খুব বুঝত। পড়াশুনো যদিও তার ভাল লাগত না, তবু বাবাকে বিপাকে না ফেলার জন্য সে পরিশ্রম করত। কিন্তু বরাবরই সে কিছু দাঙ্গাবাজ গোছের ছেলে, সহজে ভয়টয় পেত না, দরকার মতো সে মহুয়ার বহুক্ষেত্রে রুখে দাঁড়িয়েছে।

সেবার কলেজের সোস্যালে বাইরের আর্টিস্টরা গেছে অনেকে। জমজমাট ফাংশন। যথারীতি শহুরে মস্তানরা ঢুকেছে দর্শকদের জায়গায়। ভাল ভাল সীট থেকে নিরীহ ছেলেদের সরিয়ে দিয়ে সীট দখল করেছে। এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। যা হচ্ছে হোক, প্রতিবারই তো হয়। কিন্তু একজন টপ্ মস্তান যখন স্টেজ্-এ উঠে মাতাল অবস্থায় একজন গায়কার মুখের সামনে থেকে মাইক্রোফোনটা তুলে নিয়ে অকথ্য খিস্তি দিল কয়েকটা তখনই একটা গোলমালের সূত্রপাত হয়। সূত্রপাতটা অবশ্য সিন্ধু করেনি, করেছিল ধূপগুড়ির ছেলে অঙ্কুর সেন। ব্যায়াম-ট্যায়াম করত, আবার সাধারণ ব্যায়ামবীররা যেমন শরীর বাঁচিয়ে চলে সে সেরকম ছিল না। স্টেজ-এ উঠে সে ছেলেটাকে ঘাড় ধরে নামিয়ে আনল। মুহূর্তের মধ্যে দর্শকদের আসন থেকে উঠে এল মস্তানরা, তাদের হাঁকডাকে বাইরে থেকে জুটে গেল বহু। অঙ্কুর প্রথম রাউণ্ডটায় স্টেজ-এর কাছ বরাবর কয়েকবার ঘুঁষি-টুঁষি চালিয়েছিল, কিন্তু ঘেরাও মার খেয়ে জমি ধরে নিল দশ মিনিটের মধ্যে। মস্তানরা তখন স্টেজ থেকে তক্তা তুলে, মাইক ভেঙে, চেয়ার আছড়ে পুরো ভণ্ডুল লাগিয়ে দিয়েছিল। একা গিয়ে ওদের প্রতিরোধ করার মতো বোকামি দেখায়নি সিন্ধু, কিন্তু ব্যাপারটা মনে রেখেছিল। সেই রাতেই সে নেতৃত্ব নিয়ে হোস্টেলের ছেলেদের

মিটিং ডাকে। আধঘণ্টার মিটিং, কোনো বাদ-প্রতিবাদ হয়নি। সকলেরই রক্ত আগুন হয়ে আছে। শুধু কি করতে হবে তার প্ল্যানটা সিন্ধু বাতলে দিল। সেই ঘটনার পর পুলিস এল অনেক রাতে। হোস্টেলে গিয়ে তারা আহত অঙ্কুরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। কেউ কোনো প্রতিবাদ করেনি। পুলিস চলে গেলে দু-তিনজন অধ্যাপকও এসে ছেলেদের সঙ্গে দেখা করলেন। সিন্ধু তাঁদের ব্যাপারটা বলল, সিন্ধুর প্ল্যান তাঁরাও ইংগিতে সমর্থন করে যান।

এরকম পরিকল্পিত ও ভয়ঙ্কর দাঙ্গা সিন্ধু আর কখনো করেনি। হোস্টেল থেকে সিকি মাইল দূরে বড় রাস্তার কালভার্টের ওপর মস্তানদের একটা মদ খাওয়ার আড্ডা ছিল, রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ হোস্টেলের চল্লিশজন ছেলে গিয়ে তুলে আনল তাদের। অবশ্যই বিনা প্রতিরোধে নয়। সিন্ধু নিজে অন্ততঃ পাঁচ-ছ'জনের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল রড দিয়ে। এতটা নিষ্ঠুর সিন্ধু নয়। যে দশজনকে তারা ধরে এনেছিল তাদের হোস্টেলে আনার পর বাকি ছেলেরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে একের পর এক এসে তাদের পিটিয়ে যায় প্ল্যান মাফিক। অবশ্য দশজন অনেক আগেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। সেইখানেই অবশ্য ঘটনার ইতি হয়নি। প্রায় একশ জন ছেলের একটা দল নিয়ে সিন্ধু গভীর রাত থেকে সকাল পর্যন্ত শহরের উত্তর ভাগের বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে কয়েকবারে আরো অন্ততঃ চল্লিশজন মস্তানকে জমি নেওয়ায়। এমন হঠাৎ অপ্রত্যাশিত সেই আক্রমণ যে কেউ ভাল করে আত্মরক্ষাও করতে পারেনি। সিন্ধু কত জনকে মেরেছিল তা সে আজও হিসেব করতে পারেনি। তবে মনে আছে, ভোরবেলা তার হাত ব্যথায় অবশ হয়ে এসেছিল রড চালিয়ে। পরদিন নতুন ব্যাচ গেল শহরে। মস্তানরা কেউ তখন আর প্রকাশ্যে নেই, সবাই গা-ঢাকা দিয়েছে, তবু নিরীহ কিছু ছেলে মার খেল হোস্টেলের ক্রুদ্ধ ছেলেদের হাতে।

শহরের পুলিস এটা আশা করেনি। পুরো ব্যাপারটা বুঝতে তাদের খানিক সময় গেল। যে সব অধ্যাপক সিন্ধুর কাণ্ডটা জানতেন তাঁরাই এসে সেদিন সিন্ধুকে বললেন—যথেষ্ট হয়েছে, এবার পালাও। না পালালে অ্যারেস্ট হয়ে যাবে। বাড়ি যেও না, অন্য কোথাও চলে যাও।

সিন্ধু পালাল, শিলিগুড়ি রোড থেকে এক ভদ্রলোকের জীপ্ থামিয়ে সোজা শিলিগুড়ি। বাবুপাড়ায় এক বন্ধু থাকত, মনোজ। সোজা তার বাসায় গিয়ে ঝোড়ো তপ্ত চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়ে বলল— মনোজ, আমাকে লুকিয়ে রাখ।

মনোজের বাড়িতে নাগাড়ে প্রায় এক মাস লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল তাকে। সেই বাড়িতেই সে বুকুনকে প্রথম দেখে।

ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ আর পলিটেকনিকের গণ্ডগোলের মূলে যে সিন্ধুই ছিল এটা ততদিনে পুলিস জেনে গেছে। বার দুই তাদের শিলিগুড়ির বাড়িতে পুলিস হানাও দিয়েছে তার খোঁজে। হোস্টেলে তো রোজই খোঁজখবর হয়েছে। সিন্ধুর মন তখন ভাল নেই, সব সময় দুশ্চিন্তা, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। পালিয়ে থাকতে তার ভাল লাগছিল না, অপরাধবোধ পেয়ে বসে তাতে। অন্যের বাড়িতে, অনাহুত থাকার লজ্জাও আছে। মনোজদের বাড়িতে কেউই যে তার লুকিয়ে থাকাটাকে ভাল চোখে দেখবে না, এ তো জানা কথা। মুখে কেউ কিছু বলত না বটে, কিন্তু সন্দেহের চোখে তাকাত, ফিস ফিস করে নানা কথা বলত। উপায় নেই বলেই সিন্ধু পালিয়েছিল, বাড়ির বাইরে খুব একটা বেরোত না, শিলিগুড়ির সবাই তাকে চেনে, মুহূর্তের মধ্যে পুলিসে খবর হয়ে যেতে পারে। এইসব নানা কারণে মনোজদের বাড়িতে সময়টা তার খুব ভাল কাটেনি। কেবল একটাই সুন্দর ঘটনা ঘটেছিল, বুকুনের সঙ্গে চেনা হওয়া।

মনোজের দুটি বোন। বড় বুকুন, ছোট টুকুন। দুজনকেই ধিঙ্গি মেয়ে বলা যায়। বুকুনের বয়স তখন আঠেরো-উনিশ, টুকুনের ষোল-সতেরো। টুকুন ছিল বেশ সুন্দর দেখতে। ফর্সা গোলগাল,

লম্বা, চোখমুখে চুম্বক আছে। নিজের চেহারা সম্পর্কে সে ছিল খুব সজাগ! অবসর সময়টা টুকুনের কাটত আয়নার সামনে, সাজগোজের নানারূপ টান নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাজত। সিন্ধু দেখেছে, টুকুন আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে একা একা কটাক্ষ করে. হাসে, নিজের সঙ্গে বিড় বিড় করে কথাও বলে। ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে মিশবার একটা তীব্র বেহায়া নেশাও ছিল তার। একটু স্মার্ট বা ভাল চাকরি করে এমন ছেলের দেখা পেলে সে তার সর্বস্ব নিয়ে নেমে পড়ত। ঐ অল্প বয়সেই টুকুনের অনেক ভক্ত, গোছা গোছা প্রেমপত্র পায়, রাজরাজেশ্বরীর মতো অহংকারভরে চলাফেরা করে। সিন্ধুকেও তার ভালই লেগে থাকবে। বিকেলের দিকে সিন্ধু গিয়ে পৌঁছেছিল মনোজদের বাড়িতে, হা-ক্লান্ত, উত্তেজিত, এবং অবসন্নও। গায়ে হাতে পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা, অল্প একটু জ্বরভাব। তাকে নিশ্চয়ই খুব ভাল দেখাচ্ছিল না। বাইরের ঘরে বসে সে মনোজ আর তার বাবাকে পুরো ঘটনাটা বুঝিয়ে বলছিল। সেই সময়ে দুই বোন ইস্কুল থেকে ফিরল। বয়স অনুপাতে ওদের পড়া-শুনা বেশ পেছোনো। বড় জন বুকুন, ঘরে ঢুকেই অচেনা লোক দেখে মাথা নামিয়ে ভিতরবাগে চলে গেল। টুকুনের সে-সব নেই, সে বেশ বড় বড় চোখ করে দেখল সিন্ধুকে. বুকুন না চিনলেও টুকুন সিন্ধুকে চেনে। তাই বলল—ইস্ সিন্ধুদা, দেখাই নেই যে! সিন্ধু একটু হেসেছিল, তখন মেয়েদের দিকে মনোযোগ দেওয়ার মতো মনের অবস্থা নয়। টুকুন চট্ করে ভিতরে গিয়ে ইস্কুলের সাদা খোলের শাড়ি পাল্টে, রঙীন শাড়ি, ফাউণ্ডেশন মেক-আপ, কাজলের টিপ দিয়ে সেজে এল, গলায় দার্জিলিঙের মুর্গীর ডিমের মতো বড় লাল পাথরের মালা। এসে বাবা আর দাদার সামনেই সিন্ধুর মুখোমুখি বসে হাঁ করে চেয়ে রইল। কি বেহায়ার মতো চেয়ে থাকা! ভিতরবাড়ি থেকে বার বার পর্দার আড়ালে এসে ওর মা আর দিদি ডেকে যাচ্ছে—ও টুকুন, খাবি আয়। টকন গ্রাহ্যও করছে না, বলছে—দাঁড়াও বাবা যাচ্ছি।

তখনই সিন্ধু বুঝেছিল, এ বাড়িতে থাকা তার পক্ষে একটু মুশকিল হবে। ঐ লোভী চোখ দেখেই সে বুঝে গিয়েছিল যে, টুকুনের ভিতরটা চাকুম-চুকুম করছে। এ ধরণের মেয়েরা যখন তখন যা খুশী করে ফেলতে পারে। সিন্ধু কোনো ফাঁদে পড়ে যেতে নারাজ। যেখানেই লোভ সেখানেই সে কিছু সন্দেহপ্রবণ। এই তার স্বভাব; ব্যবসাতেও সিন্ধু তাই কোনোদিনই রাতারাতি বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখেনি। স্বপ্ন বা কল্পনা জিনিসটার কিছু খামতি তার আছে। টুকুনকে দেখে সে মনে মনে সতর্ক হয়ে গেল।

তার সন্দেহ মিথ্যে নয়। পিসি মেয়ে-ওলা বাড়িতে অজ্ঞাতবাস করতে গিয়ে তার যে ভয়টা হয়েছিল সেটা সত্যিকারের ভয়। রজ্জুতে সর্পভ্রম নয়।

বাড়ির ভিতরে একটা উঠোন, উঠোনকে ঘিরে টানা বারান্দা আর বারান্দার সঙ্গে সারি দিয়ে ঘর। বাড়িটার কোনো শ্রীছাঁদ নেই, তবে বেশ আলোবাতাস আছে, বাগান-টাগানও রয়েছে। উত্তর দিককার সর্বশেষে একটা ছোট ঘরে একটা মাঝারি চৌকিতে সে আর মনোজ শুত। মনোজ একটু ভালমানুষ গোছের বেকার ছেলে; খুব সোস্যাল ওয়ার্ক করে বেড়ায়। ফাংশন, বিয়ে, বন্যা, দুর্ঘটনা, সব জায়গাতেই মনোজের হাজিরা থাকে। সংসারের কোনো দায় বা দায়িত্ব তাকে বইতে হয় না। বাবা উকিল, তাছাড়া চা-বাগানের শেয়ার, জমিজায়গা, ধূপকাঠি তৈরীর কারখানা এ সব থেকে ভাল আয় হয় ওদের। মনোজ একটা মোমবাতি তৈরীর ব্যবসা শুরু করবে, সেই নিয়ে খুব ব্যস্ত। 'এ বাড়িকে নিজের বাড়ি মনে করে গেড়ে বস, এই বলে মনোজ সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াত। সিন্ধু একা বইপত্র নাড়াচাড়া করত, শুয়ে সিগারেট খেত, মনোজের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা প্রায় বলতই না। এ ব্যাপারটায় তার খুব লজ্জা, অচেনা বাড়ির লোকজনের সঙ্গে সে কথা-টথা বলতে পারে না তেমন। মনোজের মা এসে মাঝে মাঝে গল্প করতে বসতেন। সে সব সাংসারিক কথা, মনোজ

শুধু শুনত আর হুঁ দিত। আসত এক বুড়ী দিদিমা, তার ছিল ঝুড়ি ঝুড়ি নালিশ সকলের বিরুদ্ধে। সংসারের অনেক গুহ্য কথা বুড়ী অকপটে সিন্ধুকে বলে দিত। তার ভাল লাগত না।

মনোজের দুই ভাই ছিল, সরোজ আর দাদা পঙ্কজ। পঙ্কজ বাইরে চাকরি করত, সরোজ ইস্কুলে পড়ে তখন। সে বড় কাছে ঘেঁষত না। আর কখনোই তার কাছে আসত না বুকুন। বুকুন যে ও-বাড়ির মেয়ে, ও-বাড়িতেই থাকে তা টেরই পেত না সিন্ধু। কদাচিৎ একটা রঙীন শাড়ির বিলীয়মান আঁচল দেখতে পেল কোনো দরজায় বা বারান্দায় এক ঝলক। এর বেশী বুকুনের অস্তিত্ব টের পাওয়া যেত না। তার গলার স্বর সিন্ধু তখনো শোনেইনি। কিন্তু প্রায় সময়েই দমকা বাতাসের মতো আসত টুকুন। তার কোনো শারীরিক লজ্জা ছিল না। মনের তো বালাই-ই নেই। সিন্ধুর ঘরে একটা চেয়ার-টেবিল ছিল, তবু টুকুন এসে বিছানায় সিন্ধুর গা ঘেঁষে এসে বসত, গায়ে হাত দিয়ে কথা বলত, মাথায় পাকা চুল খুঁজত, যদিও সিন্ধুর বয়সে কারো মাথায় পাকাচুল থাকার কথা নয়। কিন্তু টুকুন বলত—অনেক ছেলেদের এ বয়সেই চুল পেকে যায়। ঐ অছিলায় সিন্ধুর গা ছুঁয়ে শরীরে গরম শ্বাস ফেলে টুকুন নিজের যৌবনের জানান দিত। একদিন বিকেলে—কি সাহস—দৌড়ে এল ঘরে। পিছনে বোতামওয়ালা একটা ব্লাউজ পরনে। এবং সেটার নীচের দিকের দুটো হুক্ তখনো খোলা। এসেই পিঠ ফিরিয়ে বলল —দিন তো হুক্গুলো লাগিয়ে, কখন থেকে চেষ্টা করছি, পারছি না। সিন্ধু খুব বিব্রত, আবার কিছু আগ্রহও বোধ করছিল, হাত কাঁপছিল, গলা শুকনো, তবু এই অদ্ভুত আব্দার রেখেছিল সিন্ধু। হুক্ লাগিয়ে দেওয়ার পর এক তীব্র গুপ্ত উত্তেজনায় অবশ লেগেছিল তার। টুকুন মুখ ঘুরিয়ে হেসে বলল—থ্যাঙ্ক ইউ, এরকম লক্ষ্মী ছেলের মতো বরাবর হুক্ লাগিয়ে দেবেন তো?

মনোজের বাড়িতে তখন মাত্র দিন পনেরো কেটেছে, তার মধ্যেই এই ঘটনা। লোকজনে ভর্তি বাড়ি, কে কোথায় কি লক্ষ্য করছে

কে জানে। সিন্ধু তাই কাঁটা হয়ে রইল। সে তখন বেশ হীরো হয়ে গেছে। জলপাইগুড়ির সেই ঘটনা খবরের কাগজে ফলাও হয়ে বেরিয়েছে। তার নামের উল্লেখ অবশ্য কাগজে ছিল না। কিন্তু কয়েকজন অধ্যাপকসহ পলিটেকনিকের বহু ছাত্র গ্রেফতার হয়েছে এবং আরো কয়েকজনকে খোঁজা হচ্ছে বলে কাগজে জানিয়েছিল। কিন্তু সবাই জেনে গেছে যে সিন্ধু সেই ঘটনার মধ্যমণি ছিল। টুকুনও জানত। প্রায় সময়েই এসে মুগ্ধ বিহ্বলতায় তাকিয়ে থাকত মুখের দিকে, বলত—আপনি না একটা ডাকাত! কি করে ওরকম কাণ্ড করলেন বলুন তো! এমনিতে দেখলে তো কিছু বোঝা যায় না, খুব ভালমানুষের মতো দেখতে। এই বলে টুকুন সিন্ধুর খুব কাছাকাছি আসবার চেষ্টা করত। সিন্ধুই বা এড়ায় কি করে? বয়সের দোষ তারও কি থাকতে নেই? তবু প্রাণপণে কিছুটা সংযত রাখত নিজেকে। কিন্তু একথা সত্যি যে ইচ্ছে করলে সে যা খুশী করতে পারত টুকুনের সঙ্গে। যা খুশি। টুকুন একটুও বাধা দেবে না। এটা বুঝতে পারার পর সে খুবই দুর্বল বোধ করতে থাকে। মেয়েদের শরীর সম্পর্কে যে দুর্লভ অভিজ্ঞতাটা তার কোনোদিনই হয়নি সেই মহার্ঘ্য জিনিস টুকুন যেন ভিসে সাজিয়ে তার মুখের সামনে ধরে আছে। খেলেই হয়।

কিন্তু বাধা ছিল টুকুনের স্বভাব। শুধু সিন্ধুকে নিয়ে থাকলে না হয় বোঝা যেত। কিন্তু গোপনে খবর পেয়ে সিন্ধুর যে সব অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তার সঙ্গে দেখা করতে আসত তাদের প্রত্যেকেরই প্রতিই একটা হাঘরে লোভ ছিল তার। বাছাবাছি ছিল না, সিরিয়াসনেস ছিল না। একদিন দুপুরে সিন্ধু যখন চিৎপাত হয়ে পড়ে ঘুমের চেষ্টা করছে তখন টুকুন একটা ইংরিজি কথার মানে জিজ্ঞেস করার অছিলায় ঘরে এসে ইঙ্গিতে পূর্ণ হাসিতে দরজা বন্ধ করে দিল, আর প্রায় সিন্ধুকে চেপে ধরে শ্বাসরোধকারী অবস্থায় বুকে কনুইয়ের ঠেস দিয়ে হেলে বসে বলল—'বলুন তো ওয়েভলক কথাটার মানে কি!', তখন সিন্ধু খুবই

সুবিধাজনক অবস্থায় পেয়েও টুকুনকে চুমু খায়নি। মনে হয়েছিল—ও যা মেয়ে, ঠোঁটটা নিশ্চয়ই বারোয়ারী হয়ে আছে, কত জন না জানি চুমু খেয়েছে ওই ঠোঁটে! ভাবতেই একটা অনিচ্ছা, একটা বিবমিষা তার মনকে দূরে ঠেকিয়ে রাখল। একটা মেয়ে যত ছল্‌বলেই হোক, নিজের থেকে সহজে কোনো পুরুষকে চুমু খায় না বা জড়িয়ে ধরে না। কিন্তু কেউ তাকে খেলে বা ধরলে যে সে খুশী হয় তার জানান দেয় নানাভাবে। সেই দুপুরে টুকুনও বারংবার নানা ভাবে তাকে জানিয়েছে। পাগলের মতো তার বুকে কনুই চেপে ধরেছে, মাথার চুল ধরে টেনেছে মুঠো করে, কিল মেরেছে, চিমটি দিয়েছে। সিন্ধু ওকে তাড়িয়ে দেয়নি, আবার গ্রহণও করেনি। মনটা বড় আড় হয়েছিল সেই দুরন্ত দুপুরে। বলেছিল—তুমি এবার যাও, কেউ এসে পড়বে।

অবাক হওয়ার ভান করে টুকুন বলল—এসে পড়লে কি! গোপন কিছু তো করছি না!

সিন্ধু এর কি জবাব দেবে? এত নির্লজ্জতার পরও ওর নাকি গোপন করার কিছু নেই। সিন্ধু হেসে বলল - যা করছ তা দেখলে লোকে তোমাকে পাগল ভাববে।

—আপনাকেও ভাববে, পাগল ছাড়া কেউ ওরকম পাথর হয়ে থাকতে পারে! আপনি খুব বীর, না? ছাই!

—বীর কে বলেছে?

—লোকে বলে, সিন্ধু খুব জোর ঠাণ্ডা করেছে জলপাইগুড়ির গুণ্ডাদের। আমিও তাই ভাবতাম। এখন দেখছি ভীতুর ডিম।

সিন্ধু এসব শুনে পৌরুষবশতঃ একবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছিল। হয়তো ধরত টুকুনকে, একটা কিছু করত।

কিন্তু সেই মুহূর্তে বাইরে থেকে খুব সতর্ক নরম গলায় বুকুন ডাকল—টুকুন, চা নিয়ে যা।

দুধে ছানা কেটে গেল, অবস্থাটা পালটে গেল তৎক্ষণাৎ। টুকুন নিঃশব্দে সিন্ধুকে জিভ ভেঙিয়ে উঠে গিয়ে দরজা খুলে খুব অসংকোচে,

একটুও ধরা পড়ার জন্য ঘাবড়ে না গিয়ে বলল-- তুই দি'গে যা। আমার বয়ে গেছে।

চা হাতে দাঁড়িয়েছিল বুকুন। টুকুন চলে গেলে সে বাধ্য হয়ে ভিতরে এল। লজ্জায় নতমুখী, সমস্ত শরীর আঁচল ঘুরিয়ে ঢাকা দেওয়া। সেই প্রথম সিন্ধু তাকে ভাল করে দেখল। ম্লান গায়ের রঙ, ছোটখাটো, রোগা, শুধুমাত্র তার মুখশ্রীটি ভারী সুন্দর ডৌলের। চোখ দুটি মায়াবী লজ্জায় ভরা। মুখে একটা ভয় সঙ্কোচের ছাপ। টেবিলে চা রেখে সে চলে যাচ্ছিল, ভদ্রতাবশে সিন্ধু কিছু বলতে হয় বলে বলল—মনোজ এখনো ফেরেনি বুকুন?

বুকুন কেমন দেখতে তা বিচার করা ভারী মুশকিল। বোধহয় খুবই সাদামাটা মিষ্টি মুখশ্রী, এর বেশী কিছু বলা যায় না। তার ওপর ছোটখাটো বলে তেমন নজরও পড়ে না ওর দিকে। টুকুনের সঙ্গে তুলনাই হয় না, এর ওপর ও আবার ভীষণ লাজুক ঘরকুণো, নতমুখী। নিজেকে অত লুকিয়ে রাখে বলেই সিন্ধু ওকে এতকাল লক্ষ্যই করতে পারেনি। এখন করল আর এক ধরনের ভালই লাগল তার। সে যেমন হেমন্তের বিকেল দেখলে একটা উদাস ভাল লাগা ঠিক তেমনি। পুরুষ আর মেয়ের মধ্যে যেমনটা হয় বয়সকালে, তেমন নয়। বরং মনে হয় আমার যদি এরকম নরম-সরম বাধ্য একটা বোন থাকত, বেশ হত। অন্তত সিন্ধুর এরকমই কিছু মনে হয়েছিল।

দরজার কাছ বরাবর বুকুন থেমে একটু ঘাড় ঘুরিয়ে সিন্ধুর প্রশ্নের জবাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা কথা বলে চমকে দিল সিন্ধুকে। বলল—টুকুনকে অত লাই দেবেন না, ও ভীষণ গায়ে-পড়া।

সিন্ধুর কান গরম হয়ে গেল, বুকটাও ঢিপ ঢিপ করছিল। জোর করে একটু হেসে বলল—তাই দেখছি। ওকে তোমরা সামলে রাখতে পার না, না?

—না। সবাই ওকে নিয়ে ভাবে। সব সময়ে একটা গণ্ডগোল পাকাচ্ছে।

সিন্ধু আস্তে করে বলল - যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে তাহলে বরং আমি অশোকদের বাড়িতে চলে যাই। কাল ও বলছিল--- ওদের বাসায় থাকবার জায়গা আছে।

বুকুন তখন ফিরে দাঁড়িয়ে তার দিকে এক পলক তাকিয়ে বলে—বা, তাই বলেছি বুঝি! আমি বললাম—বা রে!

এই বলে বুকুন ভীষণ অপ্রতিভ। গুছিয়ে কথা বলার মতো মেয়েমানুষীও ওর নেই, সিন্ধু বুঝে গেল।

তাই বলল—না, সে কথা তুমি বলোনি। আমিই ভাবছি।

—কেন? ও কি আপনাকে খুব জ্বালাতন করে?

সিন্ধুর মিথ্যে কথা বলতে ইচ্ছে করল না। অকপটে বলল—করে একটু। ও যে কি চায় তা তো বুঝি না। আমি ভাবছি, আমি তো বড় ছেলে, তোমাদের বাসায় আছি, তোমাদের আবার তার জন্য কোনো বদনাম না হয়।

বুকুন নখ দিয়ে দরজার গা খুঁটছিল। সেই দিকেই চেয়ে বলল—আপনার জন্য বদনাম হবে কেন! টুকুনকে সবাই চেনে। পাড়ার কেউ ওকে ভাল বলে না। নিজের বোন তবু বলছি। আপনি সাবধানে থাকবেন।

সিন্ধুর বেশ অপমান জ্ঞান আছে। এই কথা শুনেও তার ভিতরের অপমান-বোধটা ঠাণ্ডা হয়নি। বলল—আমি আর কিরকম সাবধানে থাকব বলো! ঘরের দরজায় হুড়কো লাগিয়ে তো আর সব সময় ঘরে থাকা যাবে না। তার চেয়ে আমার চলে যাওয়াই ভাল।

বুকুন দরজা খোঁটা শেষ করে আঁচল আঙুলে জড়াতে থাকে। এগুলো স্মার্টনেসের অভাব থেকে হয়। যারা নিজেদের অক্ষমতা বা অযোগ্যতা নিয়ে সব সময়ে সচেতন তাদের লোকসমক্ষে নানা মুদ্রা-দোষের অভ্যাস থাকে। আঙুলে আচল জড়াতে জড়াতে বুকুন বলে—টুকুনকে বরং আমি বকে দেব। আপনি যাবেন না।

সিন্ধু হেসে ফেলল। টুকুনকে যে বুকুন বকবে একথা ভাবতেই

তার হাসি পাচ্ছিল। টুকুন মা বা বাবা কিংবা দাদাদের কাউকেই কেয়ার করে না, বুকুনের বকাকেই কি করবে? তাছাড়া টুকুনকে বকবার মতো ক্ষমতাও তো এই রোগা নরম ভীতু মেয়েটার নেই।

সিন্ধু বলল—না তার দরকার নেই। তাহলে ও ঝগড়া করবে। খুব বিশ্রী সিচুয়েশন হবে। বকতে যেও না।

আচম্‌কা আবার সিন্ধুকে চমকে দিয়ে বুকুন তার দিকে চেয়ে ভ্রূকুঁচকে বলল—আপনি হাসলেন কেন?

প্রশ্নটার মধ্যে কোনো চ্যালেঞ্জ ছিল না, রাগ বা বিরক্তিও ছিল না। বরং যেন খুব অসহায়তা ছিল। যেন হাসি দেখে তার বড় অভিমান হয়েছে কিন্তু প্রতিশোধের সাধ্য তার নেই।

সিন্ধু বলল—তুমি রাগ করলে নাকি! এমনি হাসি পেল। টুকুন তো ভীষণ ঝগড়াটে মেয়ে তাই ওকে বকতে গেলে তুমিই বরং বকুনি খেয়ে আসবে, এই ভেবে হাসলাম।

বুকুন কথাটা নিল। হাসল না। গম্ভীর থেকেই বলল—মাও বলছিল টুকুনটা সিন্ধুকে খুব জ্বালাচ্ছে। আমাকে মা বলছিল যেন আমি আপনাকে সাবধান করে দিই।

—ঠিক আছে সাবধানেই থাকব।

—তুপুরবেলাও অনেকক্ষণ আপনার ঘরে ছিল। মা একটু আগে এসে জানালার ফাঁক দিয়ে দেখে গেছে। গিয়ে বলল—টুকুন ছেলেটাকে রেস্টও নিতে দিচ্ছে না।

সিন্ধু একথা শুনে চমকে উঠল। ভীষণ লজ্জা আর ঘেন্নায় পেল তাকে। টুকুনের মা এসে কোন্ অবস্থায় তাদের দেখে গেছে, ছি ছি! নিশ্চয়ই তারা খুব সাধু ভঙ্গিতে ছিল না! সারাক্ষণ তো টুকুন তার গায়ে শ্বাস ফেলেছে আর কনুই রেখেছে বুকে। তুজনেই দেহ স্পর্শ করেছিল তুজনের। এঃ মা!

সিন্ধু আর মুখ তুলতে পারে না লজ্জায়। কোনোক্রমে বলল—বিশ্বাস করো আমি কিছু করিনি।

কথাটা ভুল বলা হল। ওভাবে বলা সিন্ধুর উচিত হয়নি। ওরা তো তাকে দায়ী করেনি যে সাফাই গাইতে হবে।

বুকুন তখন খুব ভাল গলায় বলল—না, না, আপনি করবেন কেন! আমরা তো টুকুনকে জানি। ভীষণ পাজি, বাবা আর মার লাই পেয়ে পেয়ে এরকম হয়ে গেছে, দাদাও কিছু বলে না।

সিন্ধু তখন মুখ তুলতে পারল, বলল—কেন ওকে সবাই তোমরা প্রশ্রয় দাও?

—ও যে সুন্দর দেখতে! পড়াশুনোতেও ভাল, সেই কারণে সবাই ওকে মাথায় তুলে রেখেছে, ও যা করে কেউ কিছু বলার নেই মুখের ওপর। বললেই এমন ঝগড়া করবে!

—তোমরা ওকে ভয় পাও?

—অপমানকে সবাই ভয় পায়। একদিন না আবার আপনার সঙ্গেও ঝগড়া লাগিয়ে দেয়! ওকে বিশ্বাস নেই।

সিন্ধু মাথা নেড়ে বলল—আমি ঝগড়া করি না। কারো সঙ্গে করিনি কখনো, ভয় নেই।

বুকুন আবার তাকে চমকে দিয়ে বলে—করেননি, না! তবে কেন পালিয়ে আছেন? সবাই বলছে আপনি জলপাইগুড়িতে দাঙ্গা করে এসেছেন, পুলিস আপনাকে খুঁজছে।

—দাঙ্গা! বলে সিন্ধু অবাক। বলে—দাঙ্গা নয়। সেটা অনেক বড় ব্যাপার।

—আপনি তো খুব গম্ভীর আর শান্ত, তবে ওরকম মারপিট করলেন কেন?

এ পর্যন্ত সেই মারপিটের গল্প কারো কাছে করেনি সিন্ধু। ঐ মারপিটের মধ্যে যে তার কিছু বীরত্ব ও সাহসের ব্যাপার আছে তাও তার মনে হয়নি। তাড়া খেয়ে, পালিয়ে থেকে আর দুশ্চিন্তা করে সে সেই ঘটনার মধ্যে তার অসম সাহসী ও মরীয়া কাণ্ডকারখানার ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিল। এখন হঠাৎ এই শান্ত মেয়েটির কাছে নিজের বীরত্বের কথা প্রথম তার বলতে ইচ্ছে করল।

এই ইচ্ছেই কি ভালবাসার বীজ ?

সিন্ধু একটু আগ্রহের সঙ্গে বলল—বোসো না ঐ চেয়ারটায়।

বুকুন হাসল আর তার সুন্দর ঝিকিমিকি দাঁত দেখে আবার একটু ভাল লাগল সিন্ধুর। বুকুন বলল—দাঁড়ান কথায় কথায় চা-টা একদম ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আবার করে এনে দিয়ে বসছি।

চায়ের কাপ নিয়ে বুকুন চলে গেল। এবং কথা রাখল। ফিরে এসে গরম চায়ের কাপ হাতে দিয়ে চেয়ারে বসল। খরগোশের মতো ভীতু আর উৎসুক চোখের দৃষ্টি। সিন্ধুর ক্রমশই ব্যাপারটা ভাল লাগতে থাকে।

সেই বিকেলে অনেক কথা বলেছিল সিন্ধু। অঙ্কুরের মার খাওয়া থেকে সব। নিজের কাণ্ডকারখানার খুবই ফলাও বিবরণ দিয়েছিল সে। সেই বয়সে গায়ের জোরের গল্প বলতে খুবই ভাল লাগার কথা। বীরত্ব জিনিসটা তখনো তো খুবই সুস্বাদু।

ভীষণ মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল বুকুন। একেই তো ছেলেদের সঙ্গে একদম মেশেনি তার ওপর সিন্ধুর মতো ডাকাবুকো ছেলেকে প্রথম দেখেই সে অবাক। একটু প্রশ্রয় পেয়ে সে বুঝি ধন্য হয়ে গেল। ভক্তিভাব ফুটে উঠল চোখেমুখে।

সবশেষে করুণ মুখ করে বলল—মা গো! ওরা যদি মারত আপনাকে ?

সিন্ধু বলল—তাহলে এতক্ষণে হাসপাতাল না হয় মর্গ ঘুরে শ্মশানে গিয়ে ছাই।

—ইস, বলবেন না! ভীষণ দুষ্টু আপনি!

সিন্ধু বোকা হয়ে গেল, বলল হ্যাঁ একটু দুষ্টুই।

—কেন ওসব করতে গেলেন কেন? এখন যদি পুলিস আপনাকে ধরে তাহলে কি করবে ?

—কি আর করবে! জেলে দেবে।

—না না, কেন জেলে দেবে! আপনি তো ঠিকই করেছেন। পুরোনো আমলে বিপ্লবীরা এরকম অ্যাকশনের পর

লুকিয়ে থাকত আর সে সময়ে তাদের নানা বিপদের মধ্যেও প্রেম-ট্রেম হত, সিন্ধু এরকম ঘটনা নভেলে পড়েছে। তারও নিজেকে সেরকমই একজন মনে হচ্ছিল। খুব হীরো-হীরো লাগছিল নিজেকে। বুকুনের করুণ চোখ তাকে উদ্বেগভরে লেহন করছিল তখন।

—তবু দেবে। সিন্ধু বলল।

বুকুন বলে—এইমাত্র খবরের কাগজ দিয়ে গেল, মা পড়ছিল একটু আগে, বলল—জলপাইগুড়ির পলিটেকনিকের ছেলেদের সব ছেড়ে দিয়েছে মুচলেকা নিয়ে।

—তাই নাকি? সিন্ধু লাফিয়ে উঠল তৎক্ষণাৎ।

—আপনাকেও দেবে তো?

—দেবে দেবে। সিন্ধু আশ্বস্ত হয়ে বলে—কাগজটা আনো তো।

মনোজদের বাসায় প্রায় কুড়ি দিন থাকবার পর এইভাবে প্রথম বুকুনের সঙ্গে আলাপ হল, অবশ্য আলাপ করতে বুকুন জানত না, কথা বলার চেয়ে সিন্ধুর কথা শুনবার আগ্রহই তার বেশী ছিল। টুকুন কখনো ছাড়েনি সিন্ধুর ওপর, দামাল হাওয়ার মতো সে যখন তখন এসে ঢুকত ঘরে, খোলা ব্লাউজ আটকাতে বলেছে কয়েকবার। সিন্ধু দিয়েছেও আটকে। কখনো পড়া বুঝবার নাম করে এসে আজেবাজে প্রেম সংক্রান্ত সংস্কৃত কিংবা ইংরেজি শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করেছে, শেষদিকে গোটা দুই চিঠিও দিয়েছিল। যখন টুকুন আসত তখন বুকুন কখনো আসত না। টুকুন বিকেল বা সন্ধ্যাবেলায় থাকত না, তখন খুব ভয়ে ভয়ে এসে উঁকি দিত। ভারী খুশী হত তাকে দেখে সিন্ধু। বুকুন যে বোকা তা নয়। কিন্তু ভারী সরল তার মন সিন্ধু যা বলত তা সে মধুর মতো সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে পান করত। সিন্ধু ভয়ের গল্প বললে তার গায়ে কাঁটা দিত। করুণ কথা বললে চোখে জল আসত তার। প্রথম আলাপের পর আর মাত্র এক সপ্তাহ ছিল সিন্ধু মনোজদের বাড়িতে। ঐ সাতটা দিন বড় অদ্ভুত। ঐ সাত দিনে সিন্ধু নিশ্চিত বুঝে গিয়েছিল এই বুকুন হচ্ছে তার একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি। কোথা থেকে যে এই বোধ এল, কেন এল, তা

সিন্ধু ভেবে পায় না। হয়তো ঐ নরম, নতমুখী, মুগ্ধা ও বিহ্বলাকে দেখে যে কোনো পুরুষেরই ওরকম দখলদারী প্রবৃত্তি জেগে উঠবে। ঐ সাতদিনে ভীতু মেয়েটা দৌড়ে দৌড়ে সিন্ধুর জন্য নানা কাজ করেছে। ছোট বোনেরা যেমন দাদার জন্য মায়াবশে করে, তেমনি ডাকলেই এসেছে, যা বলেছে সিন্ধু তাই শুনেছে। এত বাধ্য মেয়ে হয় না।

সিন্ধুর বাবা আগেই খবর পেয়েছিলেন যে সিন্ধু মনোজদের বাড়িতে লুকিয়ে আছে। পুলিস পাছে তাকে 'ফলো' করে সিন্ধুর হদিস পেয়ে যায় সেই ভয়ে তিনি মনোজদের বাড়িতে সিন্ধুর খোঁজে আসতে পারেননি। প্রায় পঁচিশ দিন বাদে বাবা একদিন এলেন সিন্ধু গিয়ে তাঁকে প্রায় জড়িয়ে ধরল 'বাবা' বলে। আসলে বাবাকে জড়িয়ে ধরার মতো সম্পর্ক বাপ-ছেলের নয়। বাবা সব সময় সম্ভ্রান্ত দূরত্ব রেখে চলেন, ছেলেদের সঙ্গে কখনো সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব রাখতে তাঁর ভুল হয় না। কিন্তু সেই আবেগের মুহূর্তে দূরত্বটা রইল না। সিন্ধুকে তিনিও একটু বুকে চেপে ধরে রইলেন। পরে বললেন—এস-পির সঙ্গে কথা বলে এসেছি। তুমি জলপাইগুড়িতে গিয়ে থানায় সারেণ্ডার কর। ওরা একটা মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেবে। তোমার হয়ে আমিও একটা মুচলেকা দিয়ে এসেছি।

মনোজদের বাড়িতে থাকা শেষ হয়ে গেল। সেইদিনই সিন্ধু ও-বাড়ি থেকে চলে যাবে। প্রায় এক বস্ত্রে এসেছিল। সেই বস্ত্রগুলো তখন ধোপাবাড়িতে. সিন্ধু মনোজের জামাকাপড় কষ্টেসৃষ্টে পরে থাকে। ধোপাবাড়ির জামা প্যান্টের জন্যই আরো একটা রাত থেকে যেতে হয়। রাতটাই ছিল অদ্ভুত। টুকুন খুব কান্নাকাটি জুড়ে দিল। সে বড় নির্লজ্জ, দাদার বন্ধু চলে যাচ্ছে বলে তার পাড়া জানান দিয়ে কান্নাটা খুবই দৃষ্টিকটু। আর এমন তো নয় যে তাদের বাড়িতে সিন্ধু অনেকদিন ধরে সম্পর্ক পাতিয়েছে! বুকুন কাঁদেনি প্রকাশ্যে। কিন্তু সন্ধ্যে পার হয়ে যাওয়ার কিছু পর এক নিরালা সময়ে সে তার ম্লান মুখখানা নিয়ে সিন্ধুর ঘরে এল।

সিন্ধু বলল—চলে যাচ্ছি।

বুকুন ছলছলে চোখে চেয়ে বলল– টুকুন কেমন কাঁদছে। ও বড় ভালবাসত আপনাকে। আমি ওর মতো কাঁদতে পারি না। তাতে আপনি যেন ভাববেন না যে আমার মনখারাপ হয়নি।

সিন্ধু বুকুনের দিকে তাকাল। বাইরে ঝিঁঝি ডাকছিল। বাড়িটা নিস্তব্ধ। আর ঘরের মধ্যে তারা মাত্র দুজন। বুকের মধ্যে একটা ঢেউ উঠে ভাঙল সিন্ধুর। সে চোখ সরাল না, একদৃষ্টে চেয়ে রইল। সেইদিন পর্যন্ত সিন্ধু কোনো মেয়ের চোখে ওরকমভাবে চোখ রাখতে পারেনি দীর্ঘ সময় ধরে। কারো চোখেই সে চোখ রাখতে পারে না, বড় লজ্জা করে, অস্বস্তি হতে থাকে। কিন্তু সেদিন কিছু হল না। নিঃসঙ্কোচে সে তাকিয়ে থাকতে পারল। বুকুন, সেই লুকিয়ে-থাকা-স্বভাবের মেয়েটিও উল্টে তাকিয়ে থাকল। সিন্ধু ফের টের পেল যে এই মেয়েটির ওপর তার কবে থেকে বেশ এক অমোঘ দাবী-দাওয়া তৈরী হয়ে গেছে। এ যেন তার নিজস্ব সম্পত্তি। এটাকে কি ভালবাসা বলা যায়? কে জানে? তবু ঐরকমই হল একটা ব্যাপার। এ মেয়েটিকে তার একটুও লজ্জা করল না।

সিন্ধু বলল—বুকুন, কেন এত লুকিয়ে থাকতে তুমি এতদিন? প্রথম যখন তোমাদের বাড়িতে এলাম তখন তুমি সামনেই আসতে চাইতে না।

বুকুন বলল—আমি কারো সামনে যাই না। লজ্জা করে।

—কেন, লজ্জা করবে কেন?

—আমি তো টুকুনের মতো সুন্দর নই।

সিন্ধু তখন খুব একটা স্মার্ট জবাব দিল—তুমি কেন টুকুনের মতো সুন্দর হবে? তুমি তোমার মতো সুন্দর।

—ইস্, আমি আবার সুন্দর! আমি তো রোগা, বারোমাস অসুখে ভুগি। আমার বাড়ির লোকেও আমাকে ঠাট্টা করে বলে 'অমলা।

—অমলা কেন?

—ডাকঘরের অমল তো অসুখে ভুগত। আমাকে তাই মেয়ে-অমল বলে ক্ষ্যাপায়। অমল থেকে অমলা।

—তুমি খুব ভোগো নাকি?

—ভুগি। আমার তো অ্যাজমা আছে, ব্রঙ্কাইটিসও। টনসিল সেই ছেলেবেলা থেকে খারাপ, দুবার অপারেশন হয়েছে। আরো দু-একটা আছে, সেসব আপনার শুনে কাজ নেই।

শুনে সিন্ধুর একটু মনখারাপ হয়ে গেল। একথা ঠিকই যে বুকুন বারোমেসে রুগী। শীতকালে প্রায়দিনই হাঁফ-এর টান উঠত বলে বিছানা নিত। একটু বেশী স্নান করে ফেললেই সর্দি আর প্রবল কাশি, গলায় কম্ফর্টার আর পায়ে মোজা পরে থাকতে হত। মেয়েলা রোগ ছিল বোধ হয় কয়েকটা। যে মেয়েটাকে সিন্ধু নিজস্ব বলে চিহ্নিত করেছিল সেই হল কপালের দোষে এইরকম।

তাই সিন্ধু ভাবে, এত মেয়ে দুনিয়ায় থাকতে তার কেন মরতে বুকুনের সঙ্গেই ভাব হল!

সিন্ধু পরদিন তার হোস্টেলে ফিরে গেল। পুলিসের ঝামেলা মিটিয়ে সে আবার ক্লাস করতেও শুরু করল। কিন্তু তখন সিন্ধুর মধ্যে একটুখানি কি যেন পাল্টে গেছে। এমনিতে খুব আড্ডাবাজ বলে সে ছুটিছাটায় শিলিগুড়িতে বড় একটা আসত না। কিন্তু বুকুনের সঙ্গে ভাব হওয়ার পর তার শিলিগুড়ির ওপর একটা আলাদা টান জন্মায়। প্রায় শনিবারই সে শিলিগুড়ি রোডে লরী থামিয়ে অল্প পয়সায় চলে আসত শিলিগুড়ি। তেরাস্তার মোড় থেকে ব্যাগ কাঁধে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসত মনোজদের বাড়ি। মনোজ থাক বা না থাক, টুকুন পাড়া বেড়াতে যাক বা না যাক, বুকুন ঠিক অপেক্ষা করে থাকত। এমন নয় যে বুকুনের সঙ্গে অনেক কথা হত তার। বরং সে এলে বাড়ির অন্য লোকই তার সঙ্গে কথাবার্তা বলত। বুকুন এসে চা দিয়ে যেত, ডিমভাজা বা চিঁড়ে-ভাজা যা হোক একটা খাবারও দিত সঙ্গে। দূর থেকে চেয়ে দেখত সিন্ধুর দিকে। সেই চোখের দৃষ্টি ছিল অদ্ভুত উদ্দীপ্ত আনন্দে ভরা।

সে বুঝতে পারত প্রায় শনিবারই যে সিন্ধু আসে, তা আসে তার জন্যই। একটু রাত পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে সিন্ধু বাড়িতে চলে যেত। আবার আসত রবিবার সকালে। আবার সেই লঘু দেখা হওয়া। জলপাইগুড়িতে ফিরে যেতে হত রবিবার বিকেলেই।

এইভাবে তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ঐ রুগ্ন মেয়েটার সঙ্গে শক্ত-সমর্থ প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা সিন্ধুর কি করে যে সম্পর্ক হল তা ভগবান জানেন। কিন্তু হল। দুখানা মস্ত চোখ আর সুকুমার মুখশ্রী ছাড়া বুকুনের মেয়েমানুষের যৌবনোচিত শরীর বলতে তেমন কিছু নেই। আর সেই মুখশ্রী আর চোখের দৃষ্টি দিয়েই সিন্ধুর বুকের মধ্যে একটা কোমল বঁড়শি সে গেঁথে দিতে পেরেছিল। কিন্তু বুকুনের শরীর প্রায়ই ভাল যায় না। সারা বছর মুড়িমুড়কির মতো ট্যাবলেট খেয়ে বেঁচে ছিল।

যে বছর সিন্ধু এল, এম. ই. ফাইন্যাল দিয়ে পাকাপাকিভাবে চলে এল শিলিগুড়ি। চাকরির তখন বড় আকাল। প্রথম কয়েক ব্যাচের এল. এম. ই-র ছাত্ররা মোটামুটি ভদ্রগোছের চাকরি পেয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবাংলার বহু পলিটেকনিক থেকে প্রতি বছর ঝাঁকে ঝাঁকে ছাত্র বেরোচ্ছে, অত ছেলেকে চাকরি দেবে কে? সিন্ধু প্রথম দিকে খুব দরখাস্ত পাঠাত এখানে সেখানে, রাজ্যের রেফারেন্স আর সার্টিফিকেট যোগাড় করা ছিল। ইচ্ছে ছিল চাকরি পেলে সে বুকুনকেই বিয়ে করবে, আর বিয়ে করেই খুব ভাল করে একটা থরো ট্রিটমেণ্ট করাবে তার, আর খুব ভালবাসা দিয়ে ধীরে ধীরে তাকে সুস্থ করে তুলবে।

চাকরিই পেল না সিন্ধু। না, কথাটা ঠিক হল না। মাদ্রাজে একটা পেয়েছিল। গেল না। অতদূর যাবে বুড়োবুড়ী মা-বাবাকে ছেড়ে! আর রোগা বুকুনও বুকভাঙা কান্না কেঁদেছিল যে। এইসব মেয়েমানুষী সেণ্টিমেণ্ট দেখলে সিন্ধু বড় বিচলিত হয়ে পড়ে। তার মন বড্ড নরম। তাই শিলিগুড়িতে সে ঠিকাদারীর ব্যবসা শুরু করে। ব্যবসা ভাল চলে না। সিন্ধু হাল ছাড়ে না কখনো।

তার দায়দায়িত্ব বেশী নয়। বাবার পেনসনে সংসারটা টেনেটুনে চলে যায়, তার হাতখরচটা উঠে আসে ব্যবসা থেকে। বাড়িটা নিজেদের বলে নিরাশ্রয় হওয়ার ভাবনা নেই। তবু জীবনটা তো শুধু কোনোরকমে বেঁচে থাকা নয়। কত স্বপ্ন দেখে সিন্ধু। আর স্বপ্নভঙ্গের নৈরাশ্য থেকে তার শরীরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। মনটা ধূসরতার রঙে ভরা। বুকুনও নিজের শরীরের বৈরিতায় বন্দী হয়ে থাকে ঘরে। সিন্ধুর জীবনে সেও পারেনি তার হৃদয় ঢেলে দিতে। শুধু বড় বড় চোখে সিন্ধুর দিকে চেয়ে থাকে।

এই তো কিছুদিন আগে বড় বাড়াবাড়ি হয়েছিল বুকুনের। ক'বছর ধরেই কথা হচ্ছে একবার কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তাকে বড় ডাক্তার দেখানো হবে, এবং দরকার হলে ট্রপিক্যাল বা কোনো নার্সিং হোমে রাখা হবে কিছুকাল। হবে-হবে করে হচ্ছিল না। এইবার সত্যিই হল। আসবার সময়ে বুকুন বার বার সিন্ধুকে বলেছে, এই যে যাচ্ছি, আর ফিরব না দেখো।

—কেন, তোমার তো তেমন কিছু অসুখ নয়! অত ভাবছ কেন?

—আমার অসুখ কি তা আমিই জানি।

—আমিও জানি!

—বলো তো আমার কি অসুখ?

—তোমার অসুখের নাম সিন্ধু চ্যাটার্জি।

খুব হেসেছে বুকুন। বলেছে—মাগো! তুমি যা মজা করো না! কিন্তু তুমি কেন আমার অসুখ হতে যাবে? আমার যখন খুব শরীর খারাপ থাকে তখন তোমাকে দেখলেই আমার অসুখ অর্ধেক যেন কমে যায়। সত্যি বলছি।

বোকা মেয়ে। ঐসব কথা বলত বলে সিন্ধুর বড় বেশী মায়া। প্রেম বা ভালবাসা কিরকম তা তো জানে না সিন্ধু। টুকুনের প্রতি যেমন আলটপকা একবার আকর্ষণ জন্মেছিল সিন্ধুর, কিংবা সুন্দরী মেয়ে দেখলে যেমন শরীর-গন্ধে মন নেচে ওঠে, বুকুনকে

দেখলে তেমন হয় না, বরং খুব একটা মায়া হয়, মনটা 'আহা' বলে ওঠে।

সিন্ধুকে একা রেখে বুকুন চলে এল কলকাতায়। তার পর থেকেই সিন্ধুর মনটা বড় আনচান করে। বার বার মনে হয়—যাই, গিয়ে বুকুনকে দুটো সান্ত্বনার কথা বলে আসি।

একটা টেণ্ডার দেওয়ার দরকার পড়ল, সাপ্লাইয়ের জন্য কিছু ভাল কোম্পানীর রঙও কিনতে হবে. পি ডবালউ ডি-র রেজিস্ট্রেশনটার জন্যও একটু চেষ্টা করা দরকার—এরকম কয়েকটা কারণই জুটে গেল কলকাতায় আসার। নইলে বাস্তববাদী সিন্ধু এককাঁড়ি গাড়ি-ভাড়া দিয়ে কলকাতায় আসত না। কলকাতা এমনিতে ভালও লাগে না তার। বড় ভিড়। বড্ড বেশী গাড়ি-ঘোড়া, আর কি ভয়ঙ্কর গোলমালের শব্দ চারদিকে। শিলিগুড়ির নিরিবিলি শান্ত-শ্লথ জীবন থেকে এখানে এলে হঠাৎ যেন বড় দিশেহারা আর বোকা লাগে নিজেকে। দুদিনেই হাঁফ ধরে যায়। কি করে যে তার দাদা কবি সাগর এরকম একটা হিজিবিজি শহরের প্রেমে পড়ে গেল কে জানে!

যেদিন এল সিন্ধু তার পরদিন বিকেলে সে একা বেরিয়ে পড়ল। শরৎকালের বিকেল, আলো মরে আসছে খুব তাড়াতাড়ি। বেরোনোর সময়ে কমলা বার বার বলেছিল—এখন বেরোচ্ছিস, ফিরতে তোর রাত হয়ে যাবে দেখিস। আজ না হয় না গেলি!

সিন্ধু মাথা নেড়ে বলে—না, তাড়াতাড়ি কাজগুলো সেরে নিই। বেশীদিন থাকা যাবে না।

কমলা বলে—কাজ তো অফিসের কাজ! এই বিকেলে কোন্ অফিসটায় যাবি শুনি?

সিন্ধু হেসে বলে—এই রকম করে রোজ যদি আটকাও তো এ যাত্রা খালিহাতেই ফিরে যেতে হবে।

—যাবিই? তাহলে তাড়াতাড়ি ফিরিস। তোর দাদা রাজ্যের চীনে-খাবার এনে বসে থাকবে।

—ফিরব।

বালী স্টেশন থেকে গাড়ি ধরে হাওড়া আসতে খুব বেশী ধকল পেল না। কেবল একমাইল রাস্তা ঠেঙিয়ে স্টেশনে আসাটা যা একটু কষ্টের। কিন্তু হাওড়ায় এসে সেই গোলমেলে অব্যবস্থা চারদিকে। কোথায়, কোন্ দিকে যে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের বাস পাওয়া যাবে কে জানে! এত লোকের উল্টোপাল্টা স্রোতে দম আটকে আসে।

বহুকষ্টে সে একটা পনেরো নম্বর বাস ধরল। বাড়ির নম্বর টুকে এনেছে, বুকুন আছে তার এক মাসীর বাড়িতে। কিন্তু কোথায় নামলে বাড়িটা খুঁজে পেতে অসুবিধা হবে না, কোনো গলিঘুঁজিতে ঢুকতে হবে কিনা এসব কিছুই সে জানে না। কাঠ হয়ে বাসের মধ্যে বসে রইল।

কণ্ডাক্টরকে বলে রেখেছিল দীনেন্দ্র স্ট্রীট এলে যেন বলে দেয়। তবু সংশয়ে হাওড়া ব্রীজ পেরোতেই কয়েকবার সীট ছেড়ে উঠবার উপক্রম করল সে। পাশের ভদ্রলোক বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করলেন —কোথায় যাবেন?

সিন্ধু বলে—দীনেন্দ্র স্ট্রীটে।

—সে এখনো দেরি আছে। আমি বলে দেবো।

তবু সন্দেহ যায় না। যা গোলোকধাঁধা শহর। তার ওপর এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। গনফটটার ঘুমের বায়নার জন্য এটা হল।

দীনেন্দ্র স্ট্রীটে নেমে সে নম্বর খুঁজতে থাকে। অনেক হাঁটা অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর বড় রাস্তা থেকে একটু গলির মধ্যে ধোঁয়াটে অন্ধকারে বাড়িটার খোঁজ পাওয়া গেল। গলির মুখেই একটা মস্ত দোকানে এক কড়াই দুধ জ্বাল হচ্ছে। সিন্ধুর খিদে পেয়েছিল, এক ভাঁড় দুধ কিনে চায়ের মতো চুমুক দিয়ে দিয়ে খেল। দুধ তার ভাল লাগে না, কিন্তু পেটটায় একটা চিনচিনে ব্যথা উঠছে। ডাক্তার সাবধান করে দিয়েছে যেন কখনো খালি পেটে না

থাকে, আর প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর কিছু খেতেই হবে। সে অবশ্য খায় না, অনিয়ম করে। কিন্তু এখন পেটের ব্যথাটা উঠতেই এক কড়াই দুধ দেখে সামলাতে পারল না। তা ছাড়া দুধওলা পশ্চিমা লোকটাই বাড়ির হদিস দিয়ে দিল তাকে।

সরু সিঁড়ি বেয়ে দোতলা। বন্ধ দরজা। সিন্ধু ভয়ে ভয়ে কড়া নাড়ে। যদি এ বাড়ি না হয়? যদি চোর বলে তাকে পুলিসে দেয়? কলকাতা বড় ভয়ঙ্কর শহর, কেউ কারো আপন নয়।

দরজা খুলে একটি শাড়িপরা মেয়ে মুখ বার করল। মুখে একটা স্বভাবজাত হাসি। বেশ স্বাস্থ্য তার। লম্বার ওপর চাবুক চেহারা। মুখশ্রীর মধ্যে ব্রণহীন অল্প বয়সের লাবণ্য। লম্বা চুলের মস্ত বেণীটা বাঁ বুকের ওপর ঝুলছে। সেই বেণীটারই শেষটুকুতে রিবন বাঁধছিল।

সিন্ধু বলল—আমি শিলিগুড়ি থেকে এসেছি, মনোজের বন্ধু। ওর বোনের সঙ্গে দেখা করে যাবো।

—বুকুনদি?

—হ্যাঁ।

মেয়েটি যেন একটু বিব্রত হয়ে হঠাৎ বলল—আচ্ছা ক'টা বাজে বলুন তো!

সিন্ধু ঘড়ি দেখে বলল—পৌনে ছয়।

—এঃ! তাহলে তো সময় নেই। আমরা আজ সিনেমায় যাচ্ছি। তবু আসুন ডেকে দিচ্ছি।

খুব অপ্রস্তুত লাগছিল সিন্ধুর। অসময়ে এসে পড়েছে সে। কিন্তু সে তো জানত না যে ওরা সিনেমায় যাবে!

সামনের ঘরটা বড্ড ছোট। তার মধ্যে গাদাগাদি একটা খাটের বিছানা, দুটো বহু পুরোনো গদিআঁটা চেয়ার, টেবিল, বুক-কেস, মেহগিনি কাঠের আলনা—সব রয়েছে। একটা মস্ত আলমারিও। মনে হয় এরা বহু বছর ধরে এ বাড়িতে আছে। কয়েক পুরুষ ধরে। আর এসব জিনিসও পুরুষানুক্রমের পুরোনো

বুকুন আসবে। বহুদিন বাদে বুকুনকে দেখবে সিন্ধু। বুকটার মধ্যে একটু এলোমেলো হাওয়া পাক খেল।

সেই সুন্দর মেয়েটা ভিতরে চলে গিয়ে একটু বাদে তাড়াতাড়ি ফিরে এল। খাটের ওপর থেকে দুটো ফেলে-রাখা সেফটিপিন খুঁজে নিয়ে চলে যাচ্ছে। শাড়িতে গা ঢাকা। তবু পাতলা শাড়ির ভিতর দিয়ে দেখতে পেল সিন্ধু, মেয়েটার পিঠের দিকে ব্লাউজ হাঁ হয়ে আছে, ব্রেসিয়ারের সাদা স্ট্র্যাপ দেখা যাচ্ছে। মেয়েটার শরীরের গঠন অদ্ভুত সুন্দর। গায়ে একবিন্দু বাড়তি চর্বি নেই। কোমর সরু, অন্যান্য জায়গা চমৎকার সুডৌল, উন্নত। গায়ের ত্বক মসৃণ চিক্কন। তাকিয়ে দেখলে বেশ ভাল লাগে।

বহুকালের পুরোনো আসবাবে সাজানো পুরোনো ঘরটায় বসে সিন্ধু নানা কথা ভাবে। এরা সিনেমায় যাচ্ছে, বড় অসময়ে এসে পড়েছে সে। লজ্জাও করছে একটু একটু। বুকুন ছাড়া এ বাড়িতে সে কাউকে চেনে না। আর বুকুনের সঙ্গেও তো তার সম্পর্কটা অন্যরকম। কেউ কিছু সন্দেহ করবে না তো? এই মেয়েটা কে? বুকুনের মাসতুতো বোন কি? ভারী সুন্দর দেখতে তো।

ভিতরের ঘর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ আসে। স্পষ্ট নয়। কারণ পর্দার আড়ালে দরজা ভেজানো রয়েছে। তবু সিন্ধু শুনতে পায়, উচ্চকণ্ঠে কে একটা মেয়ে বলল—যাও না বুকুন, তাড়াতাড়ি দেখা করে এসো, বেশী কিন্তু সময় নেই। গল্প করতে বসে যেও না আবার, ভদ্রলোককে বিদেয় করে চলে এসো।

আর একটা মেয়ে বলল—কে গো বুকুনদি?

এবার বুকুনের গলা শোনা গেল, সে দরজার কাছ থেকেই বোধ হয় মৃদুকণ্ঠে বলল—শিলিগুড়ির ছেলে, দাদার বন্ধু।

এই বলতে বলতে বুকুন ঘরে এল।

এ ঘরে জোরালো আলো নেই। একটা কম পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বলছে। এ বাল্‌বটাও বোধ হয় খুবই পুরোনো। আলোর

মধ্যে মাকড়শার জালের মতো আঁকিবুকি। সেই আলোতে যেটুকু বুকুনকে দেখা গেল তাতে চমকে উঠল সিন্ধু। একেই বুঝি রূপান্তর বলে! যেন গুটিপোকা থেকে মথ বেরিয়ে এসেছে। না, এতোটা নয় ঠিকই। এ যে বুকুন তা চেনা যাচ্ছে, কিন্তু সেই রোগা রুগ্ন ভাসা-ভাসা-চোখের বুকুন তো এ নয়! অল্প ক'দিনেই কলকাতার জল আর গঙ্গার হাওয়ায় একটা বুকুন দুটো বুকুনের সমান মোটা-সোটা হয়েছে। অসম্ভব সেজেছেও। সিনেমায় যেতে হলে অত সাজে মেয়েরা? পুরোনো কিন্তু ভীষণ দামী খয়েরী রঙের একটা বেনারসী পরেছে, শাড়িটার সর্বাঙ্গে এক বিঘৎ বড় বড় জরির কল্কা আর বুটি: এত বেশী জরি যে জমি প্রায় দেখাই যায় না। বুকুনের চোখে লেপ্টানো কাজল, মস্ত ভুয়ো খোঁপা, গলায় বকলসের মতো সেঁটে আছে সোনার চৌখুপীওলা চিক। ভ্রূ নিশ্চিত প্লাক্ করেছে, নইলে ওর ভ্রূ তো অত সরু আর টানাটানা ছিল না? বাঁ কব্জিতে ঘাড়, নখে ন্যাচারাল কালারের পালিশ।

সিন্ধু এত অবাক হয়েছিল যে কথা বলতে পারল না।

বুকুন একটু লজ্জার হাসি হেসে বলল—কবে আসা হল?

ভাববাচ্যে কথা। 'তুমি'ও না 'আপনি'ও না। সিন্ধুও একটু সতর্ক হয়ে বলল—এই তো কাল।

—আমি কিন্তু এর মধ্যেই একটু মোটা হয়েছি, না?

—একটু? সিন্ধু মাথা নেড়ে বলে—আয়না দেখ না?

ঘরের মধ্যে আরো কয়েক পা এগিয়ে এল বুকুন, খাটের কানা ধরে কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বলল—ক'দিন থাকা হবে?

—ঠিক নেই। সিন্ধু বলল—কাজে এসেছি, কাজ মিটলেই ফিরে যাবো। তোমার অসুখের কি হল?

—হচ্ছে। তবে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়নি।

—একটা অপারেশন হওয়ারও কথা ছিল না?

বুকুন অত সাজগোজে আড়ষ্ট হয়ে আছে, না সিন্ধুকে লজ্জা পাচ্ছে এতদিন পরে দেখে তা বোঝা গেল না। কিন্তু খুব কাঠ

হয়ে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থেকে এক ধরনের নিস্পৃহ গলায় বলল—দরকার হয়নি। ওরাল ট্রিটমেণ্টেই কাজ হয়েছে। সামনের মাসে মাসিদের সঙ্গে চুনার যাবো।

সিন্ধু যেন শুনে খুশী হল না। খবরটা তো ভালই। বুকুনের অপারেশন হবে না, শরীর সেরে যাচ্ছে, এসব তো ভাল খবরই। তবু যেন মনে ভয় আসে, যে বুকুনকে সে নিজের সম্পত্তি মনে করত সে বুঝি এ নয়। এ বুকুনকে সে কি ওরকম নিজের মেয়েমানুষ বলে বোধ করতে পারে!

—সিনেমায় যাচ্ছো? সিন্ধু বলল।

—হাঁা। এমন সময়ে তুমি এলে—

—তাতে কি? দেখে গেলাম, শিলিগুড়ি গিয়ে বলব।

—রোজ সিনেমা আর থিয়েটার! একটু ভ্রূ কুঁচকে বুকুন বলল, যেন বা তার এত ফুর্তি ভাল লাগে না।

—বেশ মজায় আছো তাহলে!

—মজা মনে করলে মজা।

—তোমার ভাল লাগে না?

সে কথার উত্তর না দিয়ে বুকুন হঠাৎ বলে—টুকুনের সঙ্গে দেখা হয় বুঝি রোজ?

সিন্ধু হেসে ফেলল। খুব ছেলেমানুষ ছাড়া এভাবে কেউ জিজ্ঞেস করে?

সিন্ধু বানিয়ে বলল—হয়।

বলে সিন্ধু উঠল। বলল—আজ তো সিনেমায় যাচ্ছো, দেরি করিয়ে দিয়ে গেলাম।

—আবার কবে আসবে?

—এ যাত্রায় বোধ হয় আর নয়। সময় হবে না। তুমি কি শিলিগুড়ি ফিরবে শীগগীর?

বুকুনের মুখটা একটু ম্লান হয়ে গেল। বড় লাজুক অপ্রতিভ মেয়ে। মাথা নত করে বলল—এখান থেকে 'ফিরতে দিচ্ছে না'

কেউ। কথা চলছে, আমার বিয়ে ঠিক করে এখান থেকেই বিয়ে দিয়ে তবে ছাড়বে।

সিন্ধুর বুক চমকে উঠল। সে এ দিকটা কখনো ভাবেনি, কিন্তু ভাবা উচিত ছিল না কি!

মুখে জোর করে একটু হাসি ফুটিয়ে সে বলল—ভালই তো। বাঃ, বেশ! সম্বন্ধ দেখা হচ্ছে?

বুকুন একঝলক তাকাল, বলল—হচ্ছে। শোনো, তোমার সঙ্গে আমার অনেক জরুরী কথা আছে। পরশু বিকেলে একবার আসবে?

—কি কথা বুকুন?

—সে কথা বলার সময় তো এখন নেই। পরশু আসবে?

উদাস হয়ে সিন্ধু বলে—দেখি।

—আজ চাও খেয়ে গেলে না!

—পরশু যদি সময় হয় তো আসব। তখন চা খেয়ে যাবো। কিন্তু যদি আসতে না পারি, তবে ধরে নিও আর দেখা হল না।

—না, ওসব বুঝব না। আসতে হবেই। খুব জরুরী কথা।

সিন্ধু অন্যমনস্কভাবে একটা 'হুঁ' দিয়ে বেরিয়ে এল। রাস্তায় এসেও অনেকক্ষণ ঘোর-ঘোর লাগছিল তার। এত অন্যমনস্ক যে চারপাশে ভাল দেখতে পাচ্ছিল না। তার মন থেকে একটা কুয়াশা উঠে চারপাশ ঘিরে রেখেছে। এত যে বুকুনকে নিজের বলে ভেবেছিল সিন্ধু, সেটা যে সত্যি নয় তা যেন বিশ্বাস হয় না। প্রেম কিংবা ভালবাসা কিরকম সিন্ধু তা জানে না। সে জানে কেউ কারো জন্য হয়তো জন্মায়। যেমন বুকুন। বুকুনের সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল সে।

আবার সিন্ধু ভাবল, রোগাভোগা ছিল বলেই বুঝি বুকুনকে খুব সহজলভ্য ভেবেছিল সে। এখন বুকুন কেমন সুন্দর হয়েছে, বিশ্বাস হতে চায় না বুকুন বলে। এখন এই সুন্দর বুকুনের জন্য সিন্ধুর চেয়ে ঢের যোগ্য ছেলে জুটে যাবে।

লড়াইটা কি বোকার মতো হেরে গেল সিন্ধু?

॥ আট ॥

সাগর তার পোর্টম্যান্টো পাশে রেখে ট্যাক্সির পিছনের সীটে ঘাড় এলিয়ে বসেছিল। চোখ বোজা। খুব ক্লান্ত লাগে আজকাল। যেন অনেক অনেক পথ হাঁটা হয়েছে। বহুদূর এসে পড়েছে সে। এবার কখন হয়তো ফিরতে হবে।

কোথায় ফিরবে সাগর?

জবাবটা বড় অস্পষ্ট। ঠিক বুঝতে পারে না। তবু ক্ষীণ মনে হয়, বড় দীর্ঘ পথ চলে এসেছে বিপথে, এবার ফিরতে হবে। ফেরা দরকার।

ধর্মতলা স্ট্রীট ধরে ওয়েলিংটনে এসে পড়তেই সাগর ট্যাক্সি ডাইনে ওয়েলেসলী স্ট্রীটে ঢোকাল। একটু এগিয়েই থামে। এখানে খালাসীটোলায় পার্থ রায়, অবনী চৌধুরীরা আড্ডা মারত। এখনও কি আসে ওরা? মাঝে-মধ্যে ওদের সঙ্গে আসত সাগর। এক গেলাসের ঐ সব ইয়ার-দোস্তরা ছিল তার কবিবন্ধু। কি বিপুল কবিতার স্বপ্ন তারা একদিন দেখেছিল। সাগর জানে, পার্থর তিনটে কবিতার বই বেরিয়েছে। অবনীর বোধ হয় পাঁচটা। অবনী খুব গম্ভীর কবিতা লিখত। সাগরের সব চেয়ে প্রিয় সমকালীন কবি অবনী এখন ভয়ঙ্কর নাম করে ফেলেছে। বিখ্যাত কবি, বিখ্যাত মাতাল। অনেকদিন দেখা হয়নি। বছরখানেক আগে একবার এসে দেড়শ টাকা ধার নিয়ে চলে গিয়েছিল সাগরের অফিস থেকে, আর আসেনি।

দুপুরে খালাসীটোলায় ভিড়ভাট্টা কম। মস্ত ঘরটায় কিছু নিঃঝুম ধ্যানমগ্ন লোক বসে আছে। তারা অধিকাংশই বয়স্ক মানুষ। নিম্নশ্রেণীর। কাউন্টারের কাছে দুজন ছোকরা দাঁড়িয়ে আছে। একজনকে সাগর চেনে। তুলু সেন। তুলু একসময়ে

ভাল ছবি আঁকত। এখন একটা মস্ত কোম্পানীর আর্ট ডিরেক্টর। অল্প বয়সে অসম্ভব উন্নতি করেছে।

তুলু সাগরকে চিনল। মাথা নেড়ে বলল—কি খবর?

খুবই আলগা প্রশ্ন। কোনো আন্তরিকতা নেই।

সাগর বলল—ভাল।

নগদ পাঁচ হাজার টাকার গর্ভবতী পোর্টম্যান্টোটা কাউন্টারে রেখে সাগর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে একটা একনম্বরী বোতল কিনল। মনটা আজ একদম ভাল নেই। কোথায় যেন ফিরতে হবে। কতদূর যেন যাওয়ার আছে। দীর্ঘ খোয়াই···তারপর ঝিরঝিরে স্বচ্ছ ঘুম নদী···রঙীন ও ধনুকের মতো বাঁকা একখানি সাঁকো পার হয়ে যাই এক স্বপ্নের উদ্যানে।

সাগর গেলাসটা রাখল। এক গ্লাস অল্প সোডা মেশানো তীব্র দিশি মদ তার ভেতরে হাঁচোর-পাঁচোড় করছে। মাথাটা চাঁই করে পাক মারল। উত্তেজনাবশে সে বড় তাড়াতাড়ি পান করেছে। আরও একটু সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে খাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ঐ তাড়াতাড়ি খাওয়ার দরুণ শরীরে ও মাথায় যে ঘুলিয়ে-ওঠা ভাব সেই মন্থনে একটা লাইন চলে এল। পার হয়ে যাই এক স্বপ্নের উদ্যানে! লাইনটা ভাল না যাচ্ছেতাই তা এ অবস্থায় বুঝতে পারল না সাগর। কিন্তু লিখে ফেলতে হবে। নইলে যদি নেশা কাটলে লাইনটাও হারিয়ে যায়!

পোর্টম্যান্টো খুলে সাগর তার নোটবই আর ডটপেন বার করতে গিয়ে পাঁচহাজারী প্যাকেটটা দেখতে পেল। ফালতু পাঁচ হাজার। এক পয়সার পরিশ্রম নেই, ট্যাক্সি নেই, ঝুঁকি নেই। মজুমদার বলেছিল 'ভালচারস'। কথাটা এখনো সাগরের মধ্যে বিঁধে আছে।

মাথাটা টাল খাচ্ছে। তবু সাগর কাউন্টারে নোটবই রেখে লাইনটা লিখে ফেলল। একটু আঁকাবাঁকা আর ঢেউ-ঢেউ হল লেখাটা। হাতটা কেঁপে যাচ্ছে।

তুলু এগিয়ে এসে বলল—ইন্দ্রাণীর খবর জানেন?

অন্যমনস্ক সাগর মুখ তুলে বলল—কে ইন্দ্রাণী ?

—ইন্দ্রাণী ঘোষাল। আপনার ফ্যান ছিল, মনে নেই ?

সাগরের মনে পড়ল বটে, কিন্তু ভারী অবাকও হল সে। ইন্দ্রাণী বারতিনেক বিয়ে করেছিল, কোনোবারই বিয়ে টেঁকেনি। কিন্তু বিস্ময়কর হল, ইন্দ্রাণী প্রথমবার বিয়ে করেছিল এই তুলুকেই।

হতভম্ব ভাবটা সামলে সাগর বলে—কি হয়েছে ইন্দ্রাণীর ?

তুলু খুব জোর একটা 'হাঃ' শব্দ করে কাউন্টারে ভর দিয়ে একটু হেসে বলে—স্যাড! দিন দুই আগে ঘুমের বড়ি খেয়েছিল, হাসপাতালে পড়ে আছে এখনো। ডীপ কোমা, আশা নেই।

সাগর আবার অনেকটা দিশি গেলাসে ঢেলে অল্প একটু সোডা মিশিয়ে খেতে যাচ্ছিল। তুলু বলল—অতটা কনসেন্ট্রেটেড খাবেন না। আর একটু ডাইলিউট করুন। দূর থেকে দেখছিলাম, খুব তাড়াতাড়ি খাচ্ছেন। কি হয়েছে ?

—আমি এরকমই খাই।

বলে সাগর দুটো বড় চুমুক মারল। আর একটা গেলাস চেয়ে নিয়ে তুলুর দিকে বোতলটা এগিয়ে দিয়ে বলল—খান!

তুলু ঢেলে নিয়ে মেশানো শেষ করে গেলাস তুলে বলে—চিয়ার্স্।

—চিয়ার্স্! বলে সাগর।

পরমুহূর্তেই মনে হয়—চিয়ার্স্! চিয়ার্স্ মানে কি? চিয়ার্স্ কেন? এই এখন ইন্দ্রাণীর খবর শুনবার পর আনন্দিত, হওয়ার কিছুই তো নেই। মদ্যপান করার সময়ে সহপায়ীকে চিয়ার্স্ বলার যে বিদেশী রেওয়াজ এখন চালু হয়েছে সেটাকে কুসংস্কার বলা যায় না কি? আর এই যে লোকটা তার সঙ্গে মদ খাচ্ছে এর তো আনন্দিত হওয়ার কোনো কারণই নেই। শত হলেও ইন্দ্রাণী একসময়ে এর বৌ ছিল। তারপর ছেড়ে গিয়ে পর্যায়ক্রমে আরো দুজনকে বিয়ে করেছিল ঠিকই, তবু তো বিবাহের কিছু স্মৃতি, কিছু বিষণ্ণতা থাকবে।

তুলুর মুখে কিছুই লেখা নেই। না হর্ষ, না বিষাদ, না কোনো

ভাবের প্রকাশ। তুলু বড় বেশী মদ খায়, জানে সাগর। এত বেশী মদ খায় বলে ওর মুখে কি একটা ভ্যাবলা ভাব। নাকি ওর বোধ বুদ্ধি কম? এই কথা মনে হতেই সাগর নিজের মুখটাও মনে করার চেষ্টা করে। তার মুখও কি ঐ তুলুর মতোই বোধ ও বুদ্ধিহীন হয়ে গেছে? সেও তো খুব মদ্যপান করে। আজকাল বড় বেশী খায়। মনটা ভাল লাগে না।

সাগর বলল—ইন্দ্রাণীর কথা একটু বলবেন?

তুলু গালে হাত রেখে বসেছিল, নীচের ঠোঁটটা ঝুলে গেছে একটু। অন্যমনস্কভাবে চেয়েছিল, বলল—ওর তো এরকমই কিছু হওয়ার কথা ছিল, আমি বরাবরই এরকম কিছু এক্সপেক্ট করতাম। শেষ পর্যন্ত বাদল ঘোষকে বিয়ে করেছিল। কোম্প্যানী ডিরেক্টর, চেনেন নাকি?

চেনে সাগর। অর্ডারের জন্য মাঝে মাঝে গেছে। খুব স্মার্ট চেহারার লোক বাদল। কিন্তু ঐ বুদ্ধিমান চেহারার ভিতরে বরাবরই একটা পিছল শয়তানী চাপা আছে, এটা এর চোখ দেখলেই টের পাওয়া যেত। সাগর মাথা নাড়ল।

তুলু বলে—বাদলকে বিয়ে করার পরও আমার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। ওদের বাসায় এই সেদিনও গিয়ে ড্রিঙ্ক করেছি। ইন্দ্রাণী অনেক ঠাট্টা করল পুরোনো সব কথা নিয়ে। বাদলকে খুব স্পোর্টিং লাগছিল।

সাগরের মাথাটা ভাল লাগছিল না। সে যেন ঠিক বুঝতে পারছিল না তুলুর কথা। বলল—ইন্দ্রাণীর কাছে যেতেন?

—যাব না কেন?

ঠিকই তো। যাবে না কেন? সাগর ভাবল, সে বুঝি বেশ মাতাল হয়ে পড়েছে। মাথাটা ঝাঁকাল। তারপর খুব ক্ষীণ শুকনো গলায় বলল—আজ উঠে পড়ি।

—আর একটু খান। আমি একটা বোতল নিচ্ছি।

—না, আর নয়। কাজ আছে।

—আমারও অফিসে ফেরার কথা। কিন্তু আর যাবো না। ইন্দ্রাণীর সম্মানে আজকের দিনটা হাফ্-ডে নিয়েছি। অনেকক্ষণ ড্রিঙ্ক করব। সিরিয়াস ড্রিঙ্কিং।

তবে কি একটা দুঃখু-টুঃখুও হচ্ছে তুলুর? সারাদিন ড্রিঙ্ক করবে কেন তবে ইন্দ্রাণীর সম্মানে? নাকি এসবই ওর চরিত্রগত ফেরেব্বাজি! ফেরেব্বাজ কিছু কম দেখেনি সাগর। তার লাইনে ফেরেব্বাজ গিজ্‌গিজ্‌ করছে। তুলু বোধ হয় প্রায়ই সারাদিন ড্রিঙ্ক করার জন্য এরকম একটা অছিলা খুঁজে নেয়। তাই ইন্দ্রাণীর সম্মানে ওর ড্রিঙ্ক করাটাকে সাগর তেমন গায়ে মাখতে পারল না।

কিন্তু উঠে চলেও যেতে পারল না সাগর। উঠতে যাবে, মাথাটা ফের একবার চাঁই করল। বড্ড তাড়াতাড়ি মদটা খেয়েছে সাগর। কাজটা ঠিক হয়নি। না কি স্ট্রোক-ফোকের পূর্বলক্ষণ?

মাথাটা চেপে সে একটু বসে থাকে।

তুলু বোতল নিল। সাগরের বোতলেও একটু ছিল। দুটো গেলাসে তুলুই সোডা মিশিয়ে মনের মতো করে মদটা তৈরী করে একটা গেলাস এগিয়ে দিয়ে বলল—চ্যাটার্জি, এই যে অ্যালকোহল জিনিসটা এটা কে আবিষ্কার করেছিল বলুন দেখি? তার জবাব নেই। এ জিনিসটা না থাকলে কবে দুঃখ চাপা পড়ে মরে যেতাম।

সাগর গেলাসটা তুলে নিয়ে একটু একটু করে খেতে লাগল। সঙ্গে বেশী টাকাকড়ি থাকলে সাগর কখনোই বেশী মদ্যপান করে না। মাতালদের ট্যাঁকের টাকা প্রায়ই হাপিশ হয়ে যায়। কিন্তু এখন তার সে খেয়াল রইল না। বুকটা খামচে আছে একটা দুটো তিনটে অস্পষ্ট দুঃখে।

সাগর আরো দশ বছর আগে বেশ নামকরা কবি ছিল। তখন সাগরের ছিল ভাত-কাপড়ের টানাটানি, অভাবের সংসারে কমলা আর সে দুজনে মিলে-সয়ে বয়ে থাকত। সেই অভাববোধটা

সাগরকে কখনো মলিন করেনি। অহংকারী তরুণ কবি সাগর শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় তখন যেখানে যেত সেখানেই অল্প-বেশী সম্মান পেত। অবশ্য কবিতা লিখে তেমন খ্যাতি, দেশজোড়া নাম আর কজনের হয়? সাগরেরও তেমন নাম ছিল না, কিন্তু কবিমহলে সে একসময়ে রাজার সম্মান পেয়েছে। তরুণ কবিরা ঈর্ষা করত, কলেজ ইউনিভার্সিটিতে প্রতি বছরই একদল সাহিত্যপাগল ছেলে-মেয়ে আসে—তারা সাগরের দিকে সমীহ-ভরা চোখে চেয়ে দেখত। ইন্দ্রাণী ছিল বাংলায় এম.-এর ছাত্রী। কফি হাউসে ইন্দ্রাণী অনেক প্রেমিক নিয়ে বসে থাকত, মাঝেমধ্যে তার কিছু কিছু ছন্দ দুঃখে ভরা কবিতা কয়েকটা লিট্ল ম্যাগাজিনে বেরিয়েও ছিল। ইন্দ্রাণীর প্রেমিকদের মধ্যে একজন ছিল সাগরের চেনা, সে-ই একদিন ইন্দ্রাণীর কাছে বুঝি ডাঁট নেওয়ার জন্যই সাগরের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেয়।

বড্ড বেশী চোখা চালাক মেয়ে ইন্দ্রাণী। মেয়েদের অত চালু ভাব সাগরের পছন্দ ছিল না। ঠোঁটকাটা ইন্দ্রাণী যখনতখন যৌনপ্রসঙ্গ তুলে আলোচনা করত। ছেলেদের সঙ্গে ছিল তার জলের মতো মেলামেশা। তার চেহারাটা ছিল একটু ভারী, ফর্সা, বেশ লাবণ্যে ভরা মুখ, আহ্লাদ তার সমস্ত শরীরের পাত্রে উপ্‌চে পড়ত, চুল ঈষৎ রুক্ষ, বড় বড় চোখ, চমৎকার দাঁত; বোম্বাইয়ের এক চিত্রতারকার সঙ্গে মুখের আদল ছিল বলে তাকে সবাই গীতাবালি বলে ডাকত। সাগর একনজরেই তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল বুঝি। কিন্তু ইন্দ্রাণীর প্রেমে রোজ এত লোক পড়ত যে সাগর সেই প্রেমটা হজম করে যায়। পরিচয় হওয়ার কিছুকাল পরেই সাগর এর-তার মুখে শুনতে পায় ইন্দ্রাণী বলে বেড়াচ্ছে—আমি সাগর চ্যাটার্জির প্রেমিকা!

অবশ্য নিতান্তই প্রতীক. অর্থে বলা। সাগরের প্রেমিকা অর্থে তার কবিতার প্রেমিকা। তবু সংবাদ শুনে সাগরের হৃৎপিণ্ড কিছু বেশী রক্ত তুলে ফেলে। ঝাঁ করে ওঠে সর্ব অস্তিত্ব। ওরকম সুন্দর

আর বুদ্ধিমতী একটা মেয়ে নিজেকে তার প্রেমিকা বলে প্রচার করছে।

উৎসাহভরে ঘটনাটা কমলাকে শুনিয়েছিল সাগর, কিন্তু তার ফল ভাল হয়নি। একটু গ্রাম্য-স্বভাবের কমলা ঘটনাটার মধ্যে অন্যরকম গন্ধ পেয়ে রাগারাগি করে। সেই রাগের উত্তাপ মরে যেতে না যেতেই একটা করুণ ও নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটে যায়। ইন্দ্রাণীর মধুচক্রে যারা রোজ বসত তাদের মধ্যে ইদানীং কিছু লোফার ছেলেরও আনাগোনা শুরু হয়েছিল। তারা রূপসুধা পান করা বা ইন্দ্রাণীর কথামৃত শুনে ঠাণ্ডা থাকার ছেলে নয়। তাদের মধ্যেই তিনজন একদিন ঘোর সন্ধ্যেবেলা ইন্দ্রাণীকে ট্যাক্সিতে তুলে জোর করে নিয়ে গিয়ে তিলজলার দিকে কোন ফাঁকা বাড়িতে, বলাৎকার করে। দিন দুই আটকেও তাকে রেখেছিল তারা, তারপর ছেড়ে দিয়ে নিজেরা পালিয়ে যায়।

ইন্দ্রাণীদের মতো মেয়ের জীবনে যে কোনো সময়েই এরকম ঘটনা ঘটতে পারত। এতদিন যে ঘটেনি সেটাই আশ্চর্য। সেই ঘটনার পর অল্প কিছুদিন নার্সিং হোম-এ কাটিয়ে ইন্দ্রাণী দিল্লি চলে যায়। কিছুকাল থেকে ফিরে আসে। কফি-হাউসে আসত না, কিন্তু প্রায় সময়েই ধর্মতলার দিকে একটা খুব চালিয়াৎ বড় রেস্টুরেন্টে বসে কফি বা ওয়াইনের সঙ্গে সিগারেট খেত বলে শোনা গেছে। সেই সময়ে ইন্দ্রাণীকে এক-আধবার দেখেছে সাগর। মুখ খুব রুক্ষ, পুরুষের মতো একটা কঠিন ভাব এসে গেছে চেহারায়।

একদিন দুপুরবেলা ইন্দ্রাণী কলেজ স্ট্রীটের কফি-হাউসে বসে ছিল। সঙ্গে যথারীতি কিছু ছেলে। কয়েকটা মেয়েও। হঠাৎ কোত্থেকে তুলু এসে ঢুকল। সোজা ইন্দ্রাণীর কাছে গিয়ে বলল—কতগুলো ভেড়ার সঙ্গে সব সময়ে বসে থাকতে তোমার লজ্জা করে না? চলো, আজ তোমাকে বাঘ দেখাবো!

সবাই হেসে অস্থির। তুলু গ্রাহ্য করল না, ইন্দ্রাণীর হাত চেপে

ধরে টেনে তুলে ফেলে বলল—চল। যেতেই হবে।

এরকমধারা পুরুষ হয়তো ইন্দ্রাণীর মতো মেয়েদের বেশ পছন্দ। এদের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক বন্য প্রেমের গন্ধ আছে। তুলু তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে রেজিস্ট্রি অফিসে হাজির, বিয়ের ফর্মে সই করিয়ে তবে ছাড়ল।

বিয়েটা দু-তিন বছর টিকেছিল হয়তো বা। পরের খবর সাগরের অত ভাল জানা নেই। তবে সেদিন তুলু যে ইন্দ্রাণীর ভক্তদের কাছে ঈর্ষণীয় হীরো হয়ে উঠেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সেই হীরো এই এখন সাগরকে কাতরভাবে মদ খাওয়াচ্ছে।

একটা আধমাতাল রিক্সাওয়ালাকে দিয়ে তুলু বাইরে থেকে একঠোঙা ঝালবড়া আর ঘুঘনীর চাট আনাল। বলল—খান।

সাগর ছুঁলো না। গেলাস ঠোঁটে ঠেকিয়ে রেখে মদের মধ্যে শ্বাস ছেড়ে বলল—ইন্দ্রাণীকে কি আপনি শেষ পর্যন্ত ভালবাসতেন?

তুলু কথাটা বুঝতে পারল বোধ হয়। বলল—অফ কোর্স! ডাইভোর্সের পরে আরো বেশী ভালবাসতাম। তারপর ও যেমন বিয়ে করেছে আবার, আমিও তেমনি করেছি। ছাট ডাজ্‌ন্ট্ ম্যাটার।

ঠাট্টার সুরে নয়, খুব আকুলতার সঙ্গেই যেন সাগর জিজ্ঞেস করল—ভালবাসা কাকে বলে, একটু বুঝিয়ে দেবেন?

তুলু ভাবল ঠাট্টা। খুব হাসে সে। বলে—ভালবাসা হল শরীরের ভিতরে একটা কেমিক্যাল সিক্রেশন। হরমোন-টরমোন কিছু একটা হবে, তার সঙ্গে খানিকটা হার্ট-ট্রাব্‌ল, উইথ এ মেণ্টাল অ্যাবনরম্যাল্‌সি।

ভুল বকছে মাতালটা!

সাগর পোর্টম্যাণ্টোটা আঁকড়ে ধরে খুব সাবধানে, আস্তে উঠে পড়ল। পা টলছে, মাথাটা একপাক চাঁই করে থেমে গেল, তবু টলমল করছে। চোখের দৃষ্টি তেমন স্বচ্ছ নয়। তবু সাগর তুলুকে একবার 'বাই' বলে বেরিয়ে আসতে পারল।

বিস্তর খেয়েছে সাগর। দুপুরেই এত খাওয়া ঠিক হয়নি। 'বুশ'গুলোর জন্য একটু তাগাদা দিতে যাওয়ার কথা ছিল। সে আজ আর হবে না। চুলোয় যাকগে কাজ। এখন নিজেকে সামলানোই সবচেয়ে বড় সমস্যা।

কাউণ্টারে খানিকটা ভর রেখে, খানিকটা অবলম্বনশূন্য জায়গায় টলে পড়ে যেতে যেতে সাগর বাইরে এল। শরীরটা এরকম করছে বটে, কিন্তু সে যে মাতাল হয়নি এখনো তা বুঝতে পারছিল সাগর। বুদ্ধি এখনো ঘুলিয়ে যায়নি, মাথাটা হাল্কা হয়ে মত্ততার কাছে আত্মসমর্পণ করেনি এখনো।

সাগর ট্যাক্সি খুঁজছিল। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে কষ্টে একটা পেয়ে গেল। আজ আর কোনো কাজ হবে না। কাজ তো নেই কিছু। বাড়ি ফিরে যাবে? কিন্তু বাড়ি গিয়ে হবে কি? এই অবস্থায় ছেলেমেয়ের সামনে যেতে তার রুচি হয় না। মাতাল হলে সে রাত করে ফেরে। তাছাড়া এখন সিন্ধু আর তার বন্ধু গনপত রয়েছে বাড়িতে। সিন্ধু তার দাদার এ চেহারাটা দেখেনি কখনো। আজ দেখলে হতভম্ব হয়ে যাবে। সেখানে ফেরা অসম্ভব। কিন্তু এ অবস্থায় আর কোথাও যাওয়ারও নেই।

ট্যাক্সি নিয়ে সে এল ম্যাঙ্গো লেন্-এ। কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। মজুমদারের কাছ থেকে পাঁচ হাজার পাওয়ার পর থেকেই মনটা এরকম বেচাল হয়ে আছে।

বাইরের ঘরে মদিরা নিজের প্রস্তরমূর্তি হয়ে বসে আছে। এতটা স্থির ও গম্ভীর সে কখনো ছিল না। একটু তাকায়, একটু হাসে। গলার পাথরের মালা দাঁতে কামড়ে তলচোখে চায়—এসবই তার অভ্যাসজাত। কাকে কিভাবে রিসিভ করতে হয় তা তার জানা আছে। তাই আজ তার স্থির ও বিষণ্ণ চেহারাটা ওরকম দেখাল।

দরজা ধরে দাঁড়িয়ে সাগর মদিরাকে অকপট চোখে দেখছিল। নিজের শরীরের ভারসাম্যহীনতার দরুণ ঘরের অবলম্বনহীন মেঝে

পেরিয়ে সোফার কাছে যাওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিল আর মদিরার মুখ থেকে কিছু পড়ে নেওয়ার চেষ্টাও করছিল। না, সে মাতাল নয়। তবু শরীর যখন টাল খাচ্ছে, বোধ-বুদ্ধিও একটু টাল খাচ্ছে। মদিরাকে বড় গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন ?

মদিরা তাকিয়ে সাগরকেই দেখছিল। বলল না—আসুন।

সাগরই বরং একটু অস্বস্তির হাসি হেসে জড়ানো অস্পষ্ট গলায় বলল—মজুমদার আছে ?

মদিরা আরো একটুক্ষণ জবাব না দিয়ে দেখল তাকে। তারপর হঠাৎ মাথাটা একধারে অল্প একটু নেড়ে জানাল—আছে।

খুব একটা নিশ্চিন্ত হল সাগর। মজুমদার আছে এটা যেন এক মস্ত শুভ সংবাদ। অথচ সে জানেও না মজুমদারের কাছে এই আসার মানে কি ?

এক পা দু পা টাল খেয়ে সাগর আবার একটু স্বাভাবিক ভাবে পা ফেলতে পারল। সোজা গিয়ে মজুমদারের দরজার হাতল ঘুরিয়ে ঢুকল ভিতরে। ভিতরে সুন্দর গন্ধ, আধো অন্ধকার, এক শূন্যগর্ভ আভিজাত্য। মজুমদার তার চেয়ারে চিৎ হয়ে পড়ে আছে, চোখ বোজা।

সাগর বসল।

অনেকদূর চলে এসেছে সাগর, বিপথে। এখন আবার কোথায় যেন ফিরে যেতে হবে।

এরকমই সব মনে হয় আজকাল।

সাগর ডাকল—মজুমদার !

মজুমদার ঝুম হয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর সোজা হয়ে বসবার চেষ্টা করল। বসে থেকেও শরীরটা সোজা রাখতে পারছে না।

বলল—অ্যাঁ ?

—আপনার কি হয়েছে ?

—কোনো শালা আমাকে স্পেয়ার করে না। সব সময় আমাকে

লোকে খাবলাচ্ছে। খাবলে কি হবে বাবা! আমার সব চুলোয় গেছে!

সাগর একটা শ্বাস ফেলে চুপ করে রইল খানিক। তার তেমন নেশা হয়নি। হলেও শরীরে যে প্রতিক্রিয়া তা মনটাকে কব্জা করতে পারেনি। মাথা পরিষ্কার আছে।

সাগর বলল—প্যাক্‌ট্‌ তো আপনিই করেছেন মজুমদার। আমরা তো প্রোপোজ করিনি।

মজুমদার মাছি তাড়ানোর মতো ভঙ্গী করে বলল—সব শালা ভিখিরি। আপনারা সব আউটরাইট বেগারস। আপনাদের কোনো অফিস নেই, ডেকরেশন নেই, স্ট্যাটাস নেই। লোটাকম্বল-ওয়ালাদের মতো নাঙ্গা হয়ে ব্যবসা করে বেড়ান। সেইজন্যই আপনাদের কস্টিং অত কম. টেণ্ডারে যাচ্ছেতাই লো রেট দিয়ে পেয়ে যান। আই হেট ইউ পিপল্‌। যাদের আত্মমর্যাদা নেই, আভিজাত্য নেই এখন তাদেরই যুগ। আমার এরকম ভিখিরি ভাল লাগে না। আই লাইক স্ট্যাটাস, আই লাইক ডেকরেশন। তাই আমি ভিখিরিদের মতো কম রেট দিতে পারি না। সেটা কি আমার দোষ? তাই আপনাদের মতো ভালচারদের সঙ্গে প্যাক্‌ট্‌ করতে হয়!

সাগর রাগ করতে পারছে না। রাগ আজকাল খুব সহজেই হয় সাগরের। তবু এই ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে যাওয়া ফোঁপড়া লোকটাকে তার ঘেন্না হয় না।

সাগর বলল—আই অ্যাডমিট।

মজুমদার সম্পূর্ণ বেহেড নয়। মদ খাওয়ার দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে আজকাল তারও বোধ হয় তেমন নেশা হয় না। শরীর টলে বটে কিন্তু মাথা সাফ থাকে। একটা বোতল আর দুটো গেলাস বের করে হুইস্কি ঢেলে সাগরকে দিল মজুমদার। নিজেও চোঁ চোঁ করে খেতে লাগল অনন্ত পিপাসায়।

মজুমদার বলল—আপনাদের সেল্‌ফ্‌-রেসপেক্ট নেই কেন?

আফ্‌টার অল ইউ ওয়্যার এ পোয়েট। কবিদের সম্মানবোধ তো খুব টনটনে হয় বলে শুনেছি।

হায়! মজুমদার কেন তার কবিত্বের কথা তোলে! ফড়ে, দালাল, ব্যবসায়ীরা কেন কবিতা শব্দটা উচ্চারণ করে! ওতে কবিতার শুদ্ধতা নষ্ট হয়, সতীত্ব আঘাত পায়। পৃথিবীতে অলিখিত নিয়ম আছে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া কবিতা আর কারো জন্য নয়। কেবলমাত্র ঈশ্বরের চিহ্নিত কয়েকজন রোগা, জীর্ণ প্রেমে প্রত্যাখ্যাত, অসফল মানুষই জানে কবিতার গুপ্ত সৌন্দর্য। তার শব্দের সম্মোহন। তবে কেন মজুমদার বার বার কবিতার কথা তোলে?

সাগর বলল—কবিতার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই মজুমদার। আমি যখন ব্যবসা করি তখন পুরো ব্যবসাদার, যখন কবিতা লিখি তখন কবি।

মজুমদার বোধ হয় কেঁদেছিল একটু আগে। ঘরের কম আলোটা চোখে সয়ে যাওয়ার পর সাগর মজুমদারের মুখের খুঁটি-নাটি দেখতে পাচ্ছে এখন। ফোলা-ফোলা, সজল, লাল। গলাটাও সামান্য বসা।

মজুমদার সাগরের কথা শুনতে পেল বলে মনে হল না। বলল —চারদিকে শেয়াল আর শকুন। একটা মানুষ মরে যাচ্ছে শুনলে সব চারদিকে ঘিরে এসে বসে থাকে আর ঠোঁট চাটে। যখন পুরোটা মরে যাবো তখন খুবলে খুবলে খেয়ে নেবে।

সাগরের তবু রাগ হয় না। আশ্চর্য, আজকাল দমকা রাগের বাতাসে সে যেমন প্রায়ই নড়ে ওঠে তেমন হচ্ছে না কেন?

সাগরের বড় সাধ, সে একটা চমৎকার দেশ তৈরী করবে। সেখানে থাকবে কেবল কবি আর শিল্পীরা। ভাতকাপড়ের আলোচনা সেখানে নিষিদ্ধ, ব্যবসা অচল, কোনো ফড়ে দালাল ব্যবসাদার রাজনীতির লোক সেখানে থাকবে না। যে কবিতার লোক নয় তার সেখানে প্রবেশের অধিকার নেই। সেখানে গাছে

গাছে কবিতা টাঙাবে সাগর, সেখানকার নদীর স্রোতেও কবিতারই শব্দ বয়ে যাবে। বাতাস এসে বলে যাবে কবিতার নতুন নতুন জন্মের কথা। সেখানে ডাকপিওন ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবে কবিতার খবর।

নেশাটা কি এতক্ষণে ধরেছে তাকে?

—আই হেট পোয়েটস্। মজুমদার হঠাৎ বলল।

সাগর বলল—গেট আউট!

তারপরই তার মনে হল, মজুমদারকে সে বেরিয়ে যেতে বলে কোন্ অধিকারে? এটা তো মজুমদারেরই অফিস, তার নিজের অফিস তো এটা নয় যে বের করে দেবে!

কিন্তু মজুমদার সেসব কথা খেয়াল না করে থমথমে মুখে বলল—না, আমি বেরোবো না। আপনি ইচ্ছে করলে দারোয়ানকে ডাকতে পারেন, কিন্তু আমাকে জোর করে বের না করলে আই ওন্ট গো।

সাগর টেবিলে একটা চাপড় মেরে বলল—ইউ মাস্ট্।

যদিও তখনও সাগর বুঝতে পারছিল যে কাজটা ঠিক হচ্ছে না। কোথায় যেন প্রোটোকলের ভুল হচ্ছে।

মজুমদারেরও সেই ভুল। খুব কাঁদো-কাঁদো মুখে বলে—ডোণ্ট ইনসাণ্ট মি চ্যাটার্জি। আমাকে বের করে দিলে আমি কোথায় যাবো? সবাই কি ভাববে?

সাগর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—দেন আই শ্যাল কিক ইউ আউট।

—ওঃ নো। বসুন চ্যাটার্জি। কফি খাবেন?

—না। ভবিষ্যতে যদি তুমি ফের কবিতার নাম মুখে আনো তবে জুতো মেরে—, বলে সাগর বসে পড়ে ফের।

প্রচণ্ড রেগে যাচ্ছে সাগর এখন। ঝলকে ঝলকে রাগ আসছে। আমাকে যা খুশি বলো, কবিতা নিয়ে ইয়ার্কি কেন? হু হ্যাজ গিভেন ইউ দ্য রাইট টু টেল অন পোয়েট্স? অ্যাঁ! তাহলে তো

ঠেলাওয়ালারাও এর পর জীবনানন্দের সমালোচনা করবে!

মজুমদার ভয় খেয়ে কলিং বেল টেপে। মদিরা খুব আস্তে দরজা খুলে চিত্রার্পিত হয়ে দাঁড়ায়। কথা বলে না।

মজুমদার তার দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে বলে—শোনো মদিরা, চ্যাটার্জি আমাকে ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে। বলছে, জুতো মারবে। তুমি লালবাজারে একটা ফোন করো তো!

মদিরা তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। সাগর ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে চেয়ে বলে—হ্যাঁ, ফোন করুন। তাদের বলবেন যে মজুমদার মাতাল অবস্থায় কবিতা নিয়ে কথা বলছে। বলছে, ও নাকি কবিদের ঘেন্না করে। টেল দেম, অ্যাণ্ড দে উইল টেক প্রপার অ্যাকশন্‌স্।

মদিরা খুব ক্লান্ত স্বরে বলে—কফি আসছে। আপনারা বরং কিছুক্ষণ চোখ বুজে ঠোঁট বন্ধ করে বসে থাকুন।

মজুমদার অবাক হয়ে বলে—কেন? বসে থাকব কেন? উই ক্যান ডান্স্।

সাগরেরও কথাটা পছন্দ হল। হ্যাঁ, কফি আসছে। ততক্ষণ চুপচাপ বসে না থেকে খানিকটা নাচলেও তো হয়। নাচা তো উচিতই। সব মানুষেরই দিনের মধ্যে কিছুক্ষণ খুব মনের আনন্দে নাচা উচিত।

ভেবেই সাগর উঠতে উঠতে বলে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসে থাকার মানেই হয় না। চলুন একটু নাচি। মদিরা, চলে আসুন। জয়েন আস।

মজুমদারও উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল- হু উইল গিভ দ্য মিউজিক?

—হেভেন উইল সেণ্ড দ্য মিউজিক। নাচ শুরু করুন, দেখবেন অন্তরীক্ষ থেকে বাজনার শব্দ আসছে।

এই বলে সাগর নাচ শুরু করতে যায়। মজুমদারও দুই পাক বেহেড নাচ নাচতে চেষ্টা করে। তারপর দুজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

মদিরা স্থিরচোখে দৃশ্যটা দেখে দাঁড়িয়ে। খুব গম্ভীর। সশব্দ একটা শ্বাস ফেলে সে বলল—দেখবেন, মারপিট করবেন না। তাহলে কাচ ভাঙবে।

এই বলে সাবধানে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেয় সে।

॥ নয় ॥

গনপত নাটক দেখে বেড়াতেই এসেছে। কাজকর্মে তার বড় গা নেই। সেই দেখে সিন্ধু বলে—তুই বরং নাটকের একটা দল খোল। আজকাল নাটকের ব্যবসাতেও পয়সা আছে!

গনপত রাগ করে বলে—ধ্যাৎ শালা, তুই আর্টের সঙ্গে পয়সা গুলিয়ে ফেলিস, খুব পয়সাখোর হয়েছিস সিন্ধু। আর্ট পেটের জন্য নয় রে!

—তবে কিসের জন্য?

—মগজ আর হৃদয়ের জন্য। তুই পয়সা-পয়সা করে চিমড়ে মেরে গেছিস, এসব তুই বুঝবি না।

—তোর মগজ আছে বলে জানতাম না তো। কখনো টের পাইনি এতকাল কাছাকাছি থেকেও। মগজটা কবে স্মাগ্‌ল্ করে আনালি? সিন্ধু বলে।

গনপত হাসে। বলল—গেলি না তো কাল। 'চাকভাঙা মধু' দেখলে তোরও তাক লেগে যাবে। 'তিন পয়সার পালা' আগে তিনবার দেখে গেছি, ফের যাচ্ছি, জবাব নেই।

সিন্ধু একটা শ্বাস ফেলে বলল—তুই নাটক দেখে বেড়াবি, আর আমি এদিকে কেবল এ অফিসে টেণ্ডার সেই অফিসে রেজিস্ট্রেশনের জন্য ঘুরে বেড়াবো, খুব চালাকি পেয়েছো মেড়ো ভূত! আজ গলায় গামছা দিয়ে তোকে আমার সঙ্গে দৌড় করাবো।

গনপত হাঁ-হাঁ করে উঠে বলে—বলিস কি, আজও আমার টিকিট কাটা আছে। তুই তো জানিস বাবা, আমি কোনো

জায়গায় গিয়ে ভাল করে কথা বলতে পারি না, কেউ ইংরিজি বললে ভয়ে ভিড়মি খাই। আমাকে এসবের মধ্যে রগড়াচ্ছিস কেন? তুই স্মার্ট আছিস, লড়ে যা। আমাকে একটু আর্টের জলে ঘুরে বেড়াতে দে।

সিন্ধু গনপতের মুখের দিকে অনেকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলে—গনফট, তোর কোনো প্রবলেম নেই, না?

সকাল পৌনে আটটা বাজে। এ সময়টায় গনপতের মেজাজ ভাল থাকে। তবু সে খুব ভয়ে ভয়ে সিন্ধুর মনোভাব আঁচ করার চেষ্টায় তাকিয়ে রইল। তারপর বলল—হুঁঃ প্রবলেম তুই কাকে শিখাচ্ছিস? আমার বলে সমুদ্রে শয়ান!

—ফের লাথি খাবি শালা। সমুদ্রে শয়ান! ইঃ! টাকার নয়, প্রেমের নয়, কাজকারবারে নয়, তোর কোনো একটা প্রবলেম আমি আজ পর্যন্ত খুঁজে পেলাম না। পেট ভাসিয়ে খাওয়া, পাথরের মতো ঘুমনো, নাটক দেখা, আর মাঝে মাঝে মেড়ো বাংলায় নাটক লেখার হাস্যকর চেষ্টা—তোর প্রবলেম কি?

—আছে বাবা, সে সব তুমি বুঝবে না।

সদ্য ঘুম থেকে উঠে দুজন প্রাতঃকৃত্য সেরেছে। গনপত অবশ্য কিছু আগেই উঠে ব্যায়াম সেরে নিয়েছে। এক্ষুণি চা খেতে ওপরে যাবে। এই অবসরে বসে কথা হচ্ছিল।

ওপর থেকে বাচ্চা ঝিটা এসে বলল—চা কি নীচে দেবো?

সিন্ধু মুখ তুলে বলে—দাদা উঠেছে রে?

মেয়েটা হঠাৎ একটু যেন হাসি চেপে বলল—না। তানার উঠতে এখনো দেরি হবে।

সিন্ধু গম্ভীর হয়ে যায়। খানিকটা বুঝতে পারে। কোথায় যেন একটা মস্ত গোলমাল চলছে দাদার। কাল রাতেও দাদা অনেক দেরিতে ফিরেছে। সিন্ধুর মন কাল রাতেও খুব খারাপ ছিল। কেন যে এত বুকুনের কথা মনে পড়ে! ভাবছিল বলে ঘুম আসেনি।

অনেক রাতে একটা রিকশা এসে থামল। রিকশায় বসে দাদা খুব গান গাইছে, শুনেছিল সিন্ধু। মাতাল গলা চিনতে ভুল হয় না। রিকশা থামতে-না-থামতেই গ্রালের গেট খুলে বৌদি গিয়ে দাদাকে ধরল। একটা চাপা ধমক দিয়ে বলল—কি হচ্ছে! সিন্ধু রয়েছে, ভুলে যেও না।

—সিন্ধু! বলে দাদা একটু থমকে গিয়েছিল ঠিকই। তারপর বৌদির কাঁধে ভর দিয়ে রিকশা থেকে নেমে হঠাৎ বলল—কমলা, কেন তুমি আমার এমন সর্বনাশ করলে?

—কি করেছি? আমি তোমার কি করেছি? বলে বৌদিও বুঝি কেঁদে ফেলে।

দাদা বৌদিকে ধরে ধরে সিঁড়ি বেয়ে যখন ওপরে উঠছিল তখন কয়েকবার কাতরতার শব্দ করেছিল। কি গভীর ব্যথাবেদনা থেকে মানুষ ওরকম শব্দ করে! সিন্ধু লজ্জাবশতঃ উঠে যায়নি দাদার কাছে। কিন্তু যেতে খুব ইচ্ছে করেছিল। সিন্ধু বিছানা ছেড়ে উঠে এল জানালার কাছে, তারপর গভীর রাতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে।

অনেক রাত পর্যন্ত ওপরে নানারকম শব্দ হয়েছে। কে যেন আসবাবপত্র টানাটানি করছে। বৌদির একটা নাতিউচ্চ চিৎকারও শুনেছিল সে, যেন বৌদি বলল—আঃ, ওগুলো পুড়িও না! তারপর একটা কাচভাঙার বিকট শব্দ হয়েছিল, আর অনেক জল গড়ানোর। ওপরে কিরকম নাটক অভিনয় হচ্ছে তা বড় জানতে চাইছিল সে। কিন্তু এ যেন তার পরের বাড়ি। এদের গুহ্য সংসারজীবনের মধ্যে তার প্রবেশ করতে নেই, এরকমই মনে হয়েছিল তার। তাই যায়নি।

মন ভাল নেই বুকুনের জন্য, দাদার জন্য।

—চল্ রে গনফট!

বলে সিন্ধু উঠল। গনপতকে নিয়ে উঠে এল ওপরে। বুকটা কাঁপছিল একটু। ওপরে উঠে কি দেখবে কে জানে।

সামনের ঘরটা স্বাভাবিকই আছে বৌদি রান্নাঘর থেকে বলল—তোরা বোস।

বৌদির মুখটা একঝলক যা দেখল সিন্ধু তাতে বুঝল, কালকের ঘটনা মুখটায় খুব গভীর ছাপ রেখে গেছে। রোজই বোধ হয় আজকাল এরকম সব ঘটনা ঘটছে। বৌদির চেহারায় তাই একটা লাবণ্যহীন রুক্ষ ছাপ পড়েছে।

সিন্ধু যখন বিয়ে করবে তখন বৌকে কষ্ট দেবে না। তাদের মধ্যে খুব সুন্দর বোঝাপড়া থাকবে। বৌ কে হবে সিন্ধুর!

এই প্রশ্নের একটাই অমোঘ উত্তর আছে। বুকুন। কেন বুকুন তা বোঝা যায় না। কিন্তু এ যেন গত জন্ম থেকে ঠিক হয়ে আছে। এ যেন প্রকৃতির নিয়ম যে বুকুন সিন্ধুর বৌ হবে। এ ঠিক বুকুনের সঙ্গে তার প্রেম-ভালবাসার ব্যাপার নয়। তারা যেন পরস্পরের স্বামী-স্ত্রী হওয়ার জন্যই জন্মেছে। বৌয়ের কথা ভাবলেই বুকুন বা বুকুনের কথা ভাবলেই বৌ মনে পড়ে।

অথচ তা তো হওয়ার নয়। সিন্ধু যদি উপযুক্ত পাত্র হতো তো কথা ছিল না। কিন্তু এখনো সিন্ধুর ব্যবসা দাঁড়াল না। কোনো স্থির আয় নেই। কোনো মাসে দু'হাজার টাকা লাভ হল তো বাকি ছ'মাস বসে থাকা। কোথাও কেউ চাকরি দেওয়ার জন্য বসে নেই। একটা মাঝারি চাকরি পেলেও সে বিয়ের কথা ভাবতে পারত।

ওদিকে মনোজদের বাড়ির লোকেদের উচ্চাশা বলবতী। তারা হেঁজিপেঁজি পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার কথা ভাবতেও পারে না। সেই জন্যই বুকুনের অসুখ সারাতে কলকাতায় পাঠানো হয়েছে। শরীর সারলে কলকাতায় কোনো অতি সুপাত্রের সঙ্গে অনেক খরচ করে তার বিয়ে দেবে তারা। বলতে নেই বুকুনের শরীর সেরেছে। বিয়ের ফুলও ফুটল বুঝি এবার। সিন্ধু কে? সিন্ধুর কথা তারা ভাববে কেন?

খাওয়ার টেবিলে কনুইয়ের ভর রেখে মাথা নত করে বসেছিল,

সিন্ধু। আজ বড় অন্যমনস্ক সে। মনটা বড় খারাপ।

জলখাবার খেয়ে গনফট হুশহাস শব্দ করে। গরম দুধ খাচ্ছে। সিন্ধু খাবারের প্লেট ছোঁয়নি।

সিন্ধু বিস্বাদ মুখে চা শেষ করল। অত দামী চা, তবু সে তেমন স্বাদ পেল না। একবার দুবার কয়েকবার চেয়ে দেখল, দাদার ঘরের দরজাটা পাথরের মতো বন্ধ হয়ে আছে। বার-বারই দরজাটা তার চোখকে টানে। বড় মায়া হয়। একবার দাদার ঘরে যেতে ইচ্ছে করে।

দুধ খেয়ে গনফট বলল—যাই একবার খোলা হাওয়ায় চক্কর মেরে আসি। বৌদি যাবেন নাকি আজ নাটক দেখতে? আমি তিনটে টিকিট কেটে রেখেছি।

বৌদি উঠে আসে, বলে—ওমা, গনপত তো দিব্যি তার জলখাবার খেয়ে ফেলেছে! সিন্ধু খাসনি যে বড়!

—ও ঐরকম। গনপত বলে—চা ওর অমৃত। চায়ে কারো দেহে রক্ত হয় বলে শুনেছেন? ওর হয়।

সিন্ধু বলল—তুই যা তো গনফট, হেঁটে হেঁটে খিদে বাড়াগে যা। যারা বেশী খায় তাদের বুদ্ধি মোটা হয় জানিস?

—তোমার সূক্ষ্ম বুদ্ধি তো বাবা শরীরের রসকষ টেনে নিচ্ছে। এরপর বিছানায় পড়ে যখন চিঁচিঁ করবে তখন তোমার বুদ্ধি বোধ হয় তুঙ্গে উঠবে। বৌদি, ওর কথা ছাড়ুন। চলুন আজ নাটকটা দেখে আসি।

কমলা বলল—এই আমার নাটক দেখার সময় বটে! আপনি টিকিট ফেরত দিয়ে দেবেন। নাটক এমনিতেই কত দেখছি!

গনপত অত বুঝল না। বলল—আচ্ছা।

তারপর বেরিয়ে গেল।

সিন্ধুর মুখ তুলে বৌদির দিকে তাকাতে লজ্জা করছিল। কমলা অবশ্য দাঁড়াল না, রান্নাঘরের দিকে চলে যেতে যেতে শুধু বলল—খাবার খেয়ে নে সিন্ধু। বেলা হল।

অস্ফুট স্বরে সিন্ধু বলল—দাদা উঠুক।

—সে আজ কখন ওঠে ঠিক নেই।

বৌদি চলে গেলে সিন্ধু অনেকক্ষণ একা বসে থাকে। সামনে টোস্ট, ডিম, প্রোটিনেক্স দেওয়া দুধ, কাটা আপেল, খুব ঐশ্বর্যবানেরা এরকম খায়। এই ঐশ্বর্যের একশ ভাগের এক ভাগ থাকলেও সে বুকুনকে বিয়ে করতে পারত। নয় কি?

সিন্ধু ফের নিজেকে নিজেই একটা প্রশ্ন করে—দাদাকে কি তোমার হিংসে হয় সিন্ধু?

নিজেই উত্তর খুঁজে পায়—না তো, মোটেই না।

—তবে দাদাকে দেখে, দাদার এত উন্নতি দেখে কেমন লাগছে?

—দাদার জন্য বড় কষ্ট হচ্ছে। আমি সব সময়ে মনে মনে একটা কথা ভাবি।

—কি কথা সিন্ধু?

—ভাবি, দাদার অবস্থা পাল্টে যাক। ও আবার আগের মতো হয়ে যাক। তখন ও বড় সুখী হবে। আমরাও দাদাকে ফের ফিরে পাবো।

—তাই কি হয়?

—হয় না? কেন হয় না? এই যে দাদা ঘুমোচ্ছে, এই ঘুম থেকে উঠেই ও যেন অন্য মানুষ হয়ে যায়। যেন ওর টাকার কথা, ব্যবসার কথা আর মনে না পড়ে। তখন যেন ও কেবল কবিতার কথা ভাবতে পারে।

একটু পরে কমলা এসে মুখোমুখি বসে। কিছু বলে না প্রথমে, চুপ করে থাকে। সিন্ধু কালকের ঘটনা টের পেয়েছে কিনা তার আন্দাজ করার চেষ্টাই বুঝি করে একটুক্ষণ।

তারপর বলে—কাল তোর দাদার ফিরতে অনেক রাত হল। আজ উঠতে দেরি করবে। তুই বরং খেয়ে নে, তোকেও তো আবার বেরোতে হবে।

সিন্ধু বলল—খেতে ইচ্ছে করছে না বৌদি, এসব তুলে নিয়ে

যাও। আমাকে বরং আরো এক কাপ চা দাও। সকালের দিকে তরল জিনিস ছাড়া কিছু গলা দিয়ে নামে না।

কমলা বাচ্চা ঝিটাকে চা করতে বলে এসে আবার বসে। বলে —সিন্ধু, দাদার ঘরে ঢুকে কাল কি দেখলি?

সিন্ধু মুখ তুলে চেয়ে বলে—অনেক কিছু। দেখাটা বোধ হয় উচিত হয়নি বৌদি, না?

—তা কেন, সব নিজে দেখেশুনে যা। নইলে পরে পরের মেয়ের ঘাড়ে দোষ চাপবে। মা-বাবাকে কিছু বলিস না, কিন্তু নিজের চোখে দেখে যাবি না কেন?

বলতে বলতে কমলার চোখে জল এল।

চোখ মুছে সে বলল—আমরা কিরকম হয়ে গেলাম রে সিন্ধু! কবিতার জন্য মানুষের যে এত বড় সর্বনাশ হয় জানতাম না তো। জানলে কখনো ভুলেও কি ওকে টাকা রোজগার করতে তাগাদা দিতাম?

—তুমি তো অন্যায় কিছু করোনি।

—সে আমাদের ন্যায়-অন্যায়ের সঙ্গে কি ওর মেলে? তোর আমার হিসেব দিয়ে কি ওর ভালমন্দ মাপা যায়? যখন ও মাস্টারি করত তখন কত আমুদে ছিল। ঘরে ফিরে কত হৈ-চৈ করত। এক-আধদিন মদ-টদ খেত বটে, কিন্তু এসে পায়ে ধরে ক্ষমাও চাইত। আমার পুজোর শাড়ি কিনতে পারত না, নিজের অনেক ধারকর্জ ছিল, কত কষ্টে সংসার চালাতাম, তবু যেন খুব বেঁচে ছিলাম তখন, সুখে না থাকলেও। কিন্তু এটা কি হল রে?

সিন্ধু একটু অধৈর্যের গলায় বলে—দাদাকে ডাকো বৌদি, একটু কথা বলে যাই।

—ডাকব? বলে কমলা অবাক। তারপর ধাতস্থ হয়ে বলে—কাকে ডাকব? আয় দেখে যা!

বলে উঠে গিয়ে সাগরের ঘরের দরজা আস্তে ঠেলে খুলে দিয়ে বলে—আমিই ভেজিয়ে রেখেছিলাম তোদের চোখে পড়বার ভয়ে।

আয় এখন দেখে যা।

সিন্ধু স্বপ্নোত্থিতের মতো ওঠে।

দরজায় দাঁড়িয়ে সে দেখে, ঘরময় জল গড়াচ্ছে। জলের মধ্যে কয়েকটা রঙীন মাছ মরে পড়ে আছে মেঝেয়। সারা ঘরে সেই সব লাল, রামধনুরঙা, নীল, সাদা মাছ ছড়ানো। মৃত। তার ওপর এখানে সেখানে অনেক অনেক আধপোড়া একশ টাকার নোট ছড়িয়ে আছে। নোট-পোড়া-ছাই জলে মিশে গলে যাচ্ছে। এসবের মাঝখানে টম্যাটো রঙের ভেজা কার্পেটটার ওপর সাগর শুয়ে আছে উপুড় হয়ে। গায়ে এখনো বাইরের পোশাক। মুখের কাছে মাছি ভন্‌ভন্‌ করছে।

এত সবের মধ্যে মেঝেয় মৃত মাছগুলোই বড় বেশী চোখে পড়ল সিন্ধুর। কেন অ্যাকুয়ারিয়াম সাগর ভেঙেছে, কেন টাকা পুড়িয়েছে এসব জানতে চাইল না সে। জানার দরকার নেই। সিন্ধু জানে এসবের পিছনে রয়েছে কবিতা আর কবিতা।

সাগরের ডান হাতটা কেটে গেছে কাচে। রক্ত জমাট, শুকনো। হাতের তেলোটায় এখনো রক্ত জমা বলে ক্ষতটার পরিমাণ বোঝা যাচ্ছে না।

সিন্ধু গিয়ে সাগরের কাছে হাঁটু গেড়ে বসল। হাতটা তুলে দেখল, থকথকে হয়ে রক্ত জমে আছে।

—বৌদি, তুমি দেখনি দাদার হাতটা কতখানি কেটে গেছে?

কমলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সিন্ধুকে দেখছিল। বোবা দৃষ্টি। বলল—না তো! বোধ হয় কাল যখন অ্যাকুয়ারিয়ামটা রাগ করে ভাঙল তখন কেটেছে।

কমলা গিয়ে ডেটল, তুলো আর স্টিকিং প্লাস্টার নিয়ে এল। সিন্ধু রক্ত মুছে দেখে এখনো ক্ষতস্থানে কাচের টুকরো বিঁধে আছে। সেই বেঁধা কাচের টুকরোয় নাড়া পড়তেই যন্ত্রণায় অতল ঘুমের মধ্যেও কঁকিয়ে ওঠে সাগর। একবার রক্তাভ চোখ দুটো

খুলে বুঝি সিন্ধুকে চিনতে পারল। অস্ফুট জড়ানো গলায় বলল—ছেড়ে দে।

অ্যাকুরিয়ামটা খাটের সঙ্গে লাগানো ছিল। বিল্ট ইন্। সেটা ভেঙে যাওয়ায় সারা বিছানা ভিজে সপ্‌সপ্ করছে। বিছানা চুঁইয়ে খাটের নীচে এখনো ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে। কমলা গিয়ে জানালাগুলো খুলে দিল। ঘরটার মধ্যে প্রলয়ের চিহ্নগুলি আলোতে দেখা গেল ভাল করে। কত মৃত মাছ পড়ে আছে চারধারে!

সাগরের সারা শরীর ভিজে সপ্‌সপ্ করছে। সিন্ধু সাগরকে পাঁজাকোলা করে তুলল, বলল—বৌদি, তোমাদের ঘরের বিছানায় দাদাকে শোওয়াতে হবে। দৌড়ে গিয়ে বালিশ-টালিশ ঠিক করো।

কমলা গেল।

সিন্ধু আবার সাগরকে শুইয়ে দিয়ে গায়ের ভেজা জামাকাপড়-গুলো খুলল। আণ্ডারওয়্যারটা শুধু ভেজেনি, সেটা খুলল না। সাগর যেখানে কাত হয়ে শুয়েছিল সেধারের শরীর জলে অনেকক্ষণ ভিজে ছিল বলে সাদা। শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে আছে।

সিন্ধু ইচ্ছে করে কাঁদেনি, কিন্তু হঠাৎ তার দুই চোখ বেয়ে অবিরল ধারা নামল। আণ্ডারওয়্যার পরা সাগরকে আবার পাঁজাকোলা করে তুলল সিন্ধু। সাগরের সামান্য চেতনা ফিরে এল, একবার মাথাটা তুলবার চেষ্টা করে, সিন্ধুর কাঁধটা ধরতে হাত বাড়ায়। তারপর ফের অবশ হয়ে শরীর ছেড়ে দেয়।

কমলা খুব অল্প সময়ের মধ্যে বেডকভার তুলে দুটো বালিশ দিয়ে বিছানা করে ফেলেছে। সিন্ধু সাগরকে শুইয়ে দেওয়ার সময়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেন যে কাঁদছিল!

—কাঁদিস কেন সিন্ধু? বলতে গিয়ে কমলা নিজেও সিন্ধুর মতোই কাঁদতে লাগল।

সারাদিন সিন্ধুর খুব খাটুনি গেল। গনপত সঙ্গে নেই, একা

সিন্ধু এ অফিস সে অফিস করে বেড়াল। টেণ্ডার জমা দিতে গিয়ে বুঝল, এ অর্ডারটা তার পাওয়ার আশা নেই। প্রায় এক লাখ টাকার অর্ডার, পেলে বেশ কিছু মার্জিন থাকত। কলকাতার ঠিকাদাররা অনেক বেশী সুলুকসন্ধান জানে। শিলিগুড়ি থেকে এসে তার কস্টিং যা পড়বে সেইমতো রেট দিয়েছে সিন্ধু। অনেক হাই রেট।

একই সময়ে টেণ্ডার জমা দিতে এসেছিল তারই বয়সের আর একটি ছেলে। ছেলেটির সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। কথায় কথায় সিন্ধু জিজ্ঞেস করে—কি রকম রেট দিয়েছেন?

এসব ব্যাপার সবাই গোপন রাখে বা ইচ্ছে করে বেশী রেট বলে। এ ছেলেটা সেরকম নয়। বলল—মার্কেট প্রাইসের থেকে টু পারসেণ্ট বেশী। আপনি?

সিন্ধু তেতো মুখে বলল—ফাইভ পারসেণ্ট।

রেজিস্ট্রেশনের খোঁজ করতে রাইটার্সেও গেল সিন্ধু। কিন্তু কাজ হল না। আজকের দিনটাই খারাপ। তার ছোট্ট ঠিকাদারী কোম্পানীর অনেক পয়সা শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা যাতায়াতে খরচ হয়ে গেল। আজকাল সিন্ধু খুব হিসেব করতে শিখেছে। কারো পাওনাগণ্ডা বাকি রাখে না, ইনকাম-ট্যাক্স যত কমই হোক ঠিকমতো দেয়। বেশ কিছু টাকা ঘুষ বাবদ দিতে হয় একে ওকে, সে টাকা সিন্ধু ব্যবসার খাতাপত্রে অন্য খাতে এন্ট্রি দেখাতে বড় লজ্জাবোধ করে। এই কারণেই সে হার্ডশীপে বিশ্বাসী। সে জানে, সততা বজায় রেখে চলে যদি বড় হতে হয় তবে হাড়ভাঙা শ্রম ছাড়া কিছু হওয়ার নয়। আর সেই কারণেই সে খুব হিসেবী। বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলে কৃপণ। বলুক গে। সিন্ধুকে নিজের মতো করেই বেঁচে থাকতে হবে তো।

বিকেলের দিকে কাজ শেষ হয়ে গেলে সে বাবার জন্য ফুটপাথ থেকে একটা গামছা কিনল। বাবার গামছাটা ছিঁড়ে গেছে দেখে এসেছে। মায়ের চটিটা বড্ড পুরোনো হয়েছে, মা বলে

দিয়েছিল—যদি পয়সায় কুলোয় তবে একজোড়া ফুটপাথের চটি আনিস। দোকানের দামী জিনিস আনিস না যেন। তাই কিনল সিন্ধু। মার পায়ের মাপ আনা হয়নি, চটিটা ঠিকমতো পায়ে লাগবে কিনা কে জানে? আরো দু'একটা জিনিস কেনার ইচ্ছে ছিল সিন্ধুর। স্টেনলেস স্টীলের কয়েকটা গেলাস, একটা অ্যালুমিনিয়ামের স্টোভ, বাবার একটা পাঞ্জাবির কাপড়। এগুলো কেউ ফরমাশ দেয়নি, কিন্তু সিন্ধু নানা সময়ে সংসারের নানা কথা থেকে প্রয়োজন আন্দাজ করতে পারে। ভেবেছিল কিনবে। চাঁদনীতে আর গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটে ঘুরে দরদস্তুর জানল। বড্ড দাম। পয়সার কথা ভেবেই শেষ পর্যন্ত কিনল না।

অফিস-ভাঙা-ভিড়ে উপচে পড়ছে ট্রাম-বাস। এসব যানবাহনে এভাবে ওঠার অভ্যাস তার নেই। চাঁদনীর সামনে দাঁড়িয়ে সে অসহায়ভাবে ভিড় দেখল কিছুক্ষণ। আজ কি একবার বুকুনের সঙ্গে দেখা করবে?

তার ভিতরকার এক মহৎ সিন্ধু তাকে ডেকে বলল—থাক গে, যেয়ো না। বুকুনের যদি অন্য কারো সঙ্গেই বিয়ে হয় তবে কেন ও তোমার স্মৃতি নিয়ে অন্যের ঘর করতে যাবে? ওকে বরং সেই বিপদে ফেলো না। কেউ কারো জন্য জন্মায় না সিন্ধু, পৃথিবীতে কেউ কারো নিজস্ব জিনিস নয়।

সিন্ধু খুব একটা বড় গভীর শ্বাস ছাড়ল। ঠিক কথা! তবু তার মন কেবলই বলে—বুকুন আমার ছিল, কেন অন্য কারো হবে?

সিন্ধু নিজেই উত্তর দিল—বুকুনকে তুমি তো ভালবাসো সিন্ধু, তবে কেন তার সুখের কাঁটা হবে? যতবার তোমাকে দেখবে বুকুন ততবার তার মনখারাপ হয়ে যাবে। নিজেকে সরিয়ে নাও সিন্ধু। বুকুনকে ছাড়াও তুমি বেঁচে থাকবে। হয়তো মাঝে মাঝে স্মৃতির ভয়ঙ্কর শীতবাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠবে তুমি, চোখে জল আসবে, বুক ভার হবে। তবু এইটুকু মেনে নাও।

সিন্ধু গেল না। বহুদূর হেঁটে হেঁটে হাওড়া স্টেশনে এসে ট্রেন ধরল।

সাগর আজ বেরোয়নি।

সিন্ধু দোতলায় উঠতেই কমলা সদর দরজায় তাকে ধরল। তার চোখমুখ অস্বাভাবিক। চাপা গলায় বলল—সিন্ধু, তোর দাদা ঘরে বসে ভীষণ মদ খাচ্ছে। আমি বারণ করতে গিয়েছিলাম, তেড়ে এল। তুই একবার যা। অত খেলে ও মরে যাবে।

সিন্ধু মাথা নাড়ল।

সাগরের ঘরের ভেজানো দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখল, একটা ঘোর লালরঙের বাতির আলোয় ভূতের মতো বসে আছে দাদা। টেবিলে গেলাস, ব্ল্যাকনাইট আর সোডার বোতল। ঘর ম' ম' করছে অ্যালকোহলের গন্ধে। সাগরের সামনে খোলা পড়ে আছে প্যাড আর কলম।

সিন্ধু ডাকল—দাদা!

সাগর প্রথমবার শুনতে পেল না। দ্বিতীয়বার ডাকতে খুব আস্তে মুখ ঘোরায় সাগর। তার ঠোঁটে একটা প্রায় নিঃশেষিত নেভানো সিগারেট ঝুলছে।

সাগর বলে—কে তুই?

—আমি সিন্ধু!

—ও! সাগর অস্ফুট একটা কাতর শব্দ করে বলে—আয়।

সিন্ধু চারদিকে তাকায়। ঘরটা গোছানো হয়েছে। বিছানা নতুন করে পাতা, কার্পেট নেই, মৃত মাছ বা জল নেই। শুধু খাটের সঙ্গে লাগানো অ্যাকুরিয়ামের জায়গাটা ফাঁকা ও ভয়ংকর দেখাচ্ছে।

সিন্ধু এগিয়ে গিয়ে বলে—কি করছ দাদা?

সাগর বলে—ফিরে যাচ্ছি।

—কোথায়?

—সে অনেক দূর। যতদূর এসেছি ততদূর ফিরে যেতে হবে।

সে সব তুই বুঝবি না। মা-বাবাকে দেখে রাখিস সিন্ধু। আমি তো তাদের ভাল ছেলে নই।

সাগর হাসল। আর তখন সিন্ধু টেবিলের ওপর বোতলের পাশে একটা ছোট্ট শিশি দেখতে পেল। শিশিতে অনেকগুলো ট্যাবলেট। মনে পড়ে, এ শিশিটা সাগরের কোনো ড্রয়ারে সে যেন পড়ে থাকতে দেখেছে। ওটা কি ঘুমের ওষুধ ?

খুবই সন্দেহ হতে থাকে সিন্ধুর। এখন দাদার কোনো মানসিক ভারসাম্য নেই। যা খুশী করে ফেলতে পারে।

সিন্ধু টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল। ঘোর লাল আলোয় সব কিছুই বড় অবাস্তব. কাল্পনিক দেখায়।

সিন্ধু এগিয়ে এসে প্যাডের কাগজে একটা কবিতার কয়েকটা লাইন লেখা আছে দেখল, কিন্তু এ আলোতে পড়া গেল না।

—কোথায় ফিরে যাবে দাদা ?

সাগর মাতাল হাসি হাসল। তারপর জড়ানো গলায় বলে —সে একটা ভারী রঙচঙে সাঁকো। এ পৃথিবী থেকে ওপারে গেছে, সেখানে স্বপ্নের বাগান। আমি আগে কতবার সাঁকোটা পেরিয়ে গেছি। সাঁকো ধরে ছোটাছুটি করেছি। এখন সাঁকোটা অনেক দূরে সরে গেছে। দেখতে পাই, কিন্তু কিছুতেই কাছে যেতে পারি না। কতবার চেষ্টা করি, ঠিক দেখি আমার রাস্তা সাঁকো থেকে বহু দূরে গিয়ে ঘুরে যাচ্ছে। কী যে কষ্ট না !

সিন্ধু তার চতুর হাতে শিশিটা তুলে নিল। সাগর দেখতে পেল না।

সিন্ধু বলল—দাদা, আমি কাল চলে যাবো।

সাগর উদাস গলায় বলল—সবাই তো চলে যায়, মা-বাপ, ভাই, বৌ, ছেলেমেয়ে, টাকা, কবিতা। কেউ থাকে না। আমিও যাবো।

সাগর তার গেলাস শেষ করে কিছুক্ষণ লাল আলোর ধাঁধার ভিতর দিয়ে দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকে। বিড়বিড় করে বলে—সব ছেড়ে যাবো। বহু দূর। সেখানে আশ্চর্য রঙীন ও ধনুকের

মতো বাঁকা একখানি সাঁকো, ঝিরঝিরে স্বচ্ছ ঘুম নদী, ওপাশে স্বপ্নের বাগান······

সিন্ধু একটু কেঁপে ওঠে। শিশিটা মুঠোয় নিয়ে বেরিয়ে আসে আস্তে আস্তে। দরজাটা ভেজিয়ে দেয়।

॥ দশ ॥

দুপুর পার করে সাগর ঘুমিয়ে উঠল।

একা ঘরে ঘুম ভেঙে খুব ভ্যাবলার মতো চেয়ে রইল সামনের দিকে, মাথা চিন্তাশূন্য, মন ভাবলেশহীন। এত নিস্তরঙ্গ লাগে নিজেকে তার যে সন্দেহ হয়, সে বুঝি বেঁচে নেই। মাথাটা এক টন লোহার মতো ভারী, চোখের ডিমে টনটনে ব্যথা। শরীরে প্রত্যেকটা হাড়ের জোড়ে খিল ধরে আছে। জেগে বিনা আয়াসে তার গলা থেকে গভীর ব্যথা সহ্য করার কোঁকানি উঠে আসছিল।

সেই শব্দে কমলা ঘরে এল, বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে রইল খানিক, ঠাণ্ডা হাতের তেলোয় কপালটা চেপে ধরল একটু।

—ক'টা বাজে? সাগর জিজ্ঞেস করে।

—দেড়টা। তুমি উঠবে না? ওঠো, স্নান করে খাও। কাল রাত থেকে কিছুই খাওনি।

সাগর মুখ বিকৃত করল খাওয়ার কথায়। জিভটা খসখসে, কাঁটা-কাঁটা, বিস্বাদ। পেটে একটা গোঁতলানি। বলল—একটা অ্যাসপিরিন-টিরিন দাও। ভীষণ ব্যথা।

কমলা একটা ট্যাবলেট আর জল এনে দিল, সাগর খুব কষ্ট করে উঠে ওষুধ খেল। বলল—আর আধঘণ্টা রেস্ট নিতে দাও।

কমলা মাথা নেড়ে বলল—আচ্ছা।

খুবই ভাল ব্যবহার করছে কমলা। এত ভাল ব্যবহার এসব অবস্থায় সাধারণতঃ করে না। আবার কালকের মতো এত বেহেড

নেশা সাগর কখনো করেনি। স্মৃতি অন্ধকার হয়ে আছে, মাতাল হওয়ার পর সে কি করে বাড়ি এল তা তার একদম মনে পড়ছে না।

কমলা তাকে শুইয়ে দিয়ে কপালে হাত রাখল, বসল পাশে। বলল—শোনো, আমি সিন্ধুর সঙ্গে শিলিগুড়ি চলে যাচ্ছি।

সাগর চোখ খুলে কমলার দিকে তাকায়—চলে যাচ্ছো?

—হ্যাঁ। সিন্ধু নিয়ে যেতে চাইছে। আমিও মত দিয়েছি।

—কেন?

—একটু বাইরে যাওয়া ভাল।

—ক'দিনের জন্য?

—সে কি বলতে পারি? শ্বশুরবাড়িতে কিছুদিন থাকব, তারপর একটু বাপের বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে আছে। অনেকদিন যাই না।

—আমাকে জিজ্ঞেস না করে মত দিলে?

—দিলাম। তোমার অনুমতি নেওয়ার কথা মনে হয়নি। তুমি তো আমাকে সহ্যই করতে পারো না।

—তার মানে তুমি আর ফিরে আসতে চাও না!

—না। তোমার এভাবে নিজেকে শেষ করা চোখে দেখবার জন্য এখানে থাকব নাকি? আমি যখন তোমার ভাল করতে পারলাম না, তোমার কবিতার সর্বনাশ করলাম, তখন আর আমার এখানে থাকার মানেও হয় না।

—সিন্ধু কোথায়? ওকে ডাকো।

—ও বেরোবে, তৈরী হচ্ছে।

—ওকে ডাকো।

কমলা উঠে গেল। একটু বাদে বাইরে যাওয়ার প্যান্ট-শার্ট, পরে সিন্ধু ঘরে আসে।

—দাদা, ডাকছো?

সাগর চোখ খুলে ভাইকে দেখে বলে—তোর বৌদি যাচ্ছে নাকি?

—হ্যাঁ। তুমি যদি বলো তো ক'দিনের জন্য নিয়ে যাই।

সাগর একটু ভাবল। তার মনখারাপ লাগছিল না একটুও।

বলল—নিয়ে যা। কিছুদিন থাকুক শিলিগুড়িতে।

—আচ্ছা।

—সকলের জন্য ফার্স্ট ক্লাসে রিজার্ভেশন করে নিস। টাকা নিয়ে যা।

—ফার্স্ট ক্লাসে কেন?

সে কথার উত্তর না দিয়ে সাগর বলে—কবে যাবি?

—যেদিন গাড়িতে রিজার্ভেশন পাবো সেদিনই।

—আচ্ছা। বলে সাগর চোখ বুজল।

দিন দুই পর বেল ভিউ ক্লিনিকে বিকেলের দিকে ইন্দ্রাণীকে দেখতে গেল সাগর। দুপুরে ফোন করে জেনেছিল, ইন্দ্রাণী বেঁচে আছে, তবে জ্ঞান নেই। অবস্থা সঙ্কটজনক।

ইন্দ্রাণীকে কেন দেখতে এল সাগর তা সে নিজেও সঠিক জানে না। বহুকাল দেখা হয়নি। সম্পর্কও কিছু নেই। তবু খুব একটা ইচ্ছে হচ্ছিল মনে মনে।

সাততলার সুইটে ইন্দ্রাণীকে রাখা হয়েছে। সুইটের ভিতরে ঢুকতেই প্রবল গোলাপ, রজনীগন্ধা আর চন্দনের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসার জো। সামনের ঘরটাতেই রাশি রাশি ফুলের তোড়া সেণ্টার টেবিলে রাখা। অল্পবয়সী নার্স একটা সুগন্ধী স্প্রে করছে ঘরে।

ডানদিকের বিছানায় শুয়ে আছে ইন্দ্রাণী, নাকে অক্সিজেন, চোখ বোজা। বিছানার পাশে তিন-চারজন পুরুষ ও মহিলা চেয়ারে বসে। তাদের একজন বাদল ঘোষ, ইন্দ্রাণীর বর্তমান স্বামী।

বাদল ভ্রূ তুলে তাকে দেখে বলল—আরে! কি খবর?

সাগর একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে—ইন্দ্রাণীকে দেখতে এলাম।

বাদল একটু বিস্ময়ের সুরে বলে—ওকে চিনতেন নাকি?

—চিনতাম, অনেককাল হয়ে গেল।

—বলেননি তো কখনো। বলে হাসল। বৌয়ের এই মর্মান্তিক অবস্থায় যে স্বামী ওরকম স্মার্ট হাসি হাসতে পারে তা জানা ছিল না সাগরের।

বাদল ঘোষের সাজগোজও চমৎকার। বাদামী চেকার্ড স্যুট পরে আছে, গলায় সরু জুতোর ফিতের মতো টাই। দাড়ি নিখুঁত কামানো। চেহারাটা একদম ফিল্মের স্টারের মতো। লম্বা, ফর্সা, স্বাস্থ্যবান, বয়সও চল্লিশের অনেক নীচে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—বসুন।

বাদল উঠে ইন্দ্রাণীর পাশে বিছানায় বসল। সাগর লক্ষ্য করে, বিছানার ওপাশে একটি ছলবলে সুন্দর মেয়ে বসে আছে। বয়স বেশী না, খুব হাসছে সে নানা কথা বলে। পোশাক দেখলেই বোঝা যায়, উচ্চবিত্ত সমাজের মেয়ে। দামী খদ্দরের একসক্লুসিভ প্রিন্টের শাড়ি পরেছে, গায়ে ব্লাউজের বদলে ঐ প্রিন্টেরই একটা চওড়া কাঁচুলির মতো কিছু পরা, সেটা আবার পিঠের দিকে গিঁট দেওয়া। কাঁধ, হাত সব নগ্ন। নাভির অনেক নীচে কাপড় নামানো। আঁচল খসে যাচ্ছে বারে বারে।

আরো দুজন এক্জিকিউটিভ চেহারার লোক বসে আছে ঘরে। সবাই ইংরিজিতে মৃদুস্বরে কথাবার্তা বলছে। একবার লণ্ডন আর নিউ ইয়র্ক শব্দ দুটো সাগর শুনতে পেল।

আচম্কা সাগর জিজ্ঞেস করল—ও কি বাঁচবে?

একটা শ্বাস ফেলে বাদল বলে—চান্স আছে, তবে রিমোট। কেন যে সেন্টিমেন্টাল হতে গেল! ম্যাড।

—ঘুমের ওষুধ পেল কোথায়?

বাদল ভ্রূ তুলে বলে—পাবে আর কোথায়! ঘরেই অজস্র রয়েছে, প্লেন্টি। সেডেটিভ না খেলে আমাদের কারোই ঘুম হয় না। নার্ভ-টেনশন!

—ডাক্তাররা কি বলছে? সুইসাইডের চেষ্টা?

—বটেই তো। একটা নোট লিখেছিল—আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয় গোছের। খুব সেন্টিমেন্টাল নোট। সকালে ঘুম থেকে উঠে দাড়ি কামাতে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলে চিঠিটা দেখে দৌড়ে ওর ঘরে গিয়ে দেখি, ডীপ কোণায় পড়ে আছে।

সেই মেয়েটা ওপাশ থেকে করুণ মুখ করে বলল—কি সুইট ছিল ইন্দ্রাণী, না বাদল ?

— সুইটেস্ট। আমি তো রোজ নতুন করে ওর প্রেমে পড়তাম।

সাগর হঠাৎ খুব গেঁয়োর মতো জিজ্ঞেস করল—তবে কেন ও ঘুমের ওষুধ খেতে গেল ?

—ঐ তো বললাম, বড্ড সেন্টিমেন্টাল ছিল। মে বি শী হ্যাড এ লাভার, কিংবা কোনো ব্যাপারে ডিসগস্টেড হয়ে পড়েছিল। কি করে বলব বলুন। শী লেড হার ওন লাইফ। আমি তো ওর ব্যাপারে কোনোদিন ইন্টারফিয়ার করিনি যে জানবো। আই অ্যাম নট এ নোজি পার্কার। চার মাসের জন্য স্টেটসে গিয়েছিলাম. ফিরে আসার এক মাসের মধ্যেই এই স্যাড ব্যাপার। এখন ঐ চার মাসে কি ডেভেলপমেন্ট হয়েছিল তা কে জানে! ও আমাকে কিছু বলেওনি। তবে ইদানীং খুব ডিপ্রেস্‌ড্‌ থাকত।

সাগর ইন্দ্রাণীর দিকে চেয়ে ছিল। আগে যেমন মোটাসোটা ছিল ইন্দ্রাণী এখন আর তেমন নেই। হয়তো স্লিমিং করে রোগা হয়ে গেছে। তার ওপর তীব্র বিষ এখন ওর শরীর জুড়ে। খুব সাদা, ফ্যাকাশে চেহারা। ঠোঁট শুকনো। নীল শাড়িতে জড়ানো শরীর প্রায় নিস্পন্দ। চেয়ে রইল সাগর। ইন্দ্রাণী কি আর কোনোদিন কথা বলবে ?

বাদল মেয়েটাকে নিয়ে সামনের ঘরটায় গিয়ে বসল। নীচু স্বরে কথা বলছে ওরা। এদিকের একজিকিউটিভ দুজন উঠল। বাদলকে উইশ করে চলে গেল। ঘর ফাঁকা, মৃত্যুপথযাত্রী ইন্দ্রাণীর মুখোমুখি বসে রইল সাগর। বহুকাল আগে ইন্দ্রাণী বলত—আমি সাগরশঙ্কর চ্যাটার্জির প্রেমিকা।

সেই কথাটাই আজ এতদিন বাদে সাগরকে টেনে এনেছে ইন্দ্রাণীর কাছে।

সুগন্ধে দম আটকে আসছে। সাগর তাই উঠল। দেয়ালজোড়া মস্ত জানালা, পর্দা সরানো। এই শীততাপনিয়ন্ত্রিত স্তব্ধ উঁচুতলার ঘর থেকে দেখা যায়, নীচে ছবির মতো সাজানো মিণ্টো পার্ক। মাঝখানে চৌকো পুকুর। পুকুরের একধারে একটা রঙীন কাঠের নৌকো বাঁধা। আর বহুদূর পর্যন্ত কলকাতাকে কি সুন্দর দেখায় ওপর থেকে। এরকম বা এর চেয়ে আরো উঁচু একটা অ্যাপার্টমেণ্টে থাকবার শখ সাগরের অনেক দিন ধরে। অত উঁচুতে থাকলে কবিতার বীজাণুরা বাতাসে বাহিত হয়ে আসবে ঘরে। কবিতার পরাগ সঞ্চারিত হবে মাথার গর্ভকোষে। অন্তরীক্ষে অদৃশ্য কবিতার পাখি উড়ে এসে বসবে সাগরের ডালপালায়।

—চললেন? বাদল জিজ্ঞেস করে।

সাগর অন্যমনস্ক চোখ ফিরিয়ে তাকে দেখে বলল—ডাক্তার কি বলছে? বাঁচবে না?

বাদল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে—ডেফিনিট কিছু নয়। আর বাঁচলেও শী উইল নট বি দি সেম এগেইন। থ্যাংক ইউ ফর কামিং। সো কাইণ্ড অফ ইউ।

মাথা নেড়ে সাগর বেরিয়ে এল। লিফ্‌টে নিচে নেমে সে রিসেপশনের পেছনে চমৎকার ওয়েটিং হল-এর একটা সোফায় বসে রইল একটু। শরীরটা ভাল লাগছে না। প্রায় তিন দিন সে মদ খায়নি। না খেলে এরকম হয় আজকাল। বসে একটা সিগারেট ধরাল।

সিগারেট শেষ হয়ে এল যখন, হঠাৎ দেখতে পেল সেই ছলবলে মেয়েটা রিসেপশনের পাশ দিয়ে একা বেরিয়ে যাচ্ছে।

সাগর হঠাৎ উঠে এল। খুব জোর কদমে হেঁটে সে ফ্লাইওয়ের মাঝামাঝি সঙ্গ ধরে ফেলল মেয়েটির। কাছে গিয়ে বলল—এক্‌সকিউজ মি, আপনি বাদল ঘোষের কে হন?

মেয়েটা একটু অবাক হয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে হেসে বলল—ওঃ, আপনি! আপনি না কিছুক্ষণ আগেই চলে এলেন?

—যাইনি। শরীরটা খারাপ লাগছিল বলে রিসেপশনে বসে ছিলাম।

মেয়েটা বিনা দ্বিধায় বলল—বাদল আর আমি—উই আর ফ্রেণ্ডস্। ইন্দ্রাণীও আমার বন্ধু ছিল।

—ছিল? এখন নেই?

—এখনো আছে। বলে হাসল মেয়েটি, বলল—দেয়ার ইজ নো মিস্টরি। ফ্রেণ্ডশীপ অ্যাণ্ড ছাটস্ অল।

—আপনি ভিজিটিং আওয়ার শেষ করে এলেন না?

—না, আমার একটা এনগেজমেণ্ট আছে। বাদল ইন্দ্রাণীর কাছে তো রয়েছেই। আপনি কি ইন্দ্রাণীর ফ্রেণ্ড?

—ওরকমই। আপনাকে একটা কথা বলি, বাদল ঘোষ ভাল লোক নয়।

মেয়েটা থমকে গেল। মুখটা কিছু কঠিন, থমথমে। বলল—দেখুন—

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই সাগর বলে—ইন্দ্রাণীও ভাল মেয়ে ছিল না। শী ইজ পেয়িং হার পেনাল্টি। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, এখনো আপনার জীবন অনেকখানি বাকি। সে জীবনটা বাদলকে দেবেন না। ইন্দ্রাণীর পরিণতি মনে রাখবেন।

লঘু পায়ে সাগর বেরিয়ে এল। তার গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল বাইরে। উঠে মুকুন্দকে গাড়ি ছাড়তে বলল। মনটা একটু হালকা লাগল তার।

তিন দিন মদ খায়নি, আজ একটু খাবে নাকি? বুকে একটা ব্যথা খোঁচা মারছে। শরীরটা ভাল নেই।

সিদ্ধান্তটা নিয়েই ভুল করল সাগর। এসপ্ল্যানেডে একটা পুরোনো মদের আড্ডায় গিয়ে সবে একটা বড় হুইস্কি নিয়ে বসে গোটা-দুই চুমুক দিয়েছে, আচমকা বুকের কপাটে একটা জোর ধাক্কা লাগল। ব্যথা নয়, কিন্তু একটা প্রবল থরথরানি। তারপর আর কিছু মনে রইল না তার।

এগার

অনেক রাত পর্যন্ত সাগর এল না। সাগর রাত করেই ফেরে, তাই কেউ চিন্তা করছিল না। কিন্তু রাত প্রায় এগারোটার সময়ে মুকুন্দ গাড়ি করে একা এসে হাজির। খবর দিয়ে গেল—সাগরবাবুর স্ট্রোক হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই।

তক্ষুনি সে-গাড়িতে উঠে কমলা যাবে। মুকুন্দ বলল—বৌদি, এত রাতে তো ঢুকতে দেবে না হাসপাতালে। সকালে যাবেন। ভয়ের কিছু নেই, আমি নিজে গিয়েছিলাম, মানিকবাবু গিয়েছিলেন। ভাল ডাক্তার দিয়ে দেখানো হয়েছে।

সিন্ধু এসে কমলাকে ধরে ভেতরে নিয়ে গেল, বলল—ভেবো না বৌদি, রাতটা পোয়াতে দাও।

কমলা অঝোরে কাঁদল। ঘুমোতে গেল না। সিন্ধুও বসে রইল ওপরের খাওয়ার ঘরে, কমলার কাছাকাছি। বুকে অজানা ভয়, অদ্ভুত এক মৃত্যু-অনুভূতি।

খুব ভোরের ট্রেন ধরে কমলা আর সিন্ধু এল কলকাতায়। মেডিক্যাল কলেজে ভিজিটিং আওয়ার্স তখনো শুরু হয়নি। দুজনে হাসপাতালের চত্বরে বসে রইল অসহায়ের মতো। অনেকক্ষণ। একটু বেলায় জেনারেল ওয়ার্ডের অজস্র বেড-এর মধ্যে অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে যখন সাগরের বিছানা খুঁজে পেল তখন সাগর কাউকে চিনতে পারছে না। মুখটা বাঁদিকে বেঁকে গেছে খানিকটা, বাঁ চোখটার পলক নেই, শরীরে অসাড় ভাব। একটা গোঙানির শব্দ করছিল থেমে থেমে। শ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। পাশের বেডে একটা লোক ভোররাতে মারা গেছে, তার সর্বাঙ্গ কম্বল দিয়ে ঢাকা, চারদিকে একটা পর্দার আড়াল এইমাত্র দিয়ে গেল লোক এসে। আত্মীয়রা এসে কান্নাকাটি করছে দূরে দাঁড়িয়ে।

কমলা কত কষ্টে যে সচেতনতা ধরে রেখেছে, কেন যে এখনো অজ্ঞান হয়ে যায়নি তা কেউ বুঝতে পারবে না। সাগরের পাশটিতে বসে বুকের ওপর মাথা রেখে সে বলল—কেন চলে যাচ্ছো এত তাড়াতাড়ি? আমার টাকাপয়সা কিছু চাই না, শুধু তুমি থাকো।

সাগর গোঙায়।

সিন্ধু বৌদিকে সরিয়ে আনে সাগরের বুক থেকে। বাস্তব জ্ঞান থেকে সে জানে বুকে ভার পড়া সাগরের পক্ষে ক্ষতিকর। কমলা সাগরের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে রইল।

একজন কমবয়সী নার্স এসে বলল—পেসেণ্টকে ডিস্টার্ব করবেন না। উত্তেজনা ওঁর পক্ষে ক্ষতিকর।

সিন্ধু সাগরের মাথায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। এরকম কিছু একটা সে প্রত্যাশা করছিল। দাদা বড় বেশী টেনশনে আছে, বড় ভেঙেও পড়েছে ইদানীং। গরীব অবস্থা থেকে এত তাড়াতাড়ি বড়লোক হওয়া তার উচিত হয়নি। এই বিশাল রূপান্তরটা কোনোদিনই সাগরের সহ্য হয়নি।

তারা আসবার পনেরো-বিশ মিনিট বাদেই এল মাণিক। মাণিকের সঙ্গে তার বৌ ছবি। এই সকালেও দুজনেই খুব ফিটফাট সেজে এসেছে। মাণিকের পরনে স্ট্রেচ্-এর বেলবটম, জাপানী ছাপা বুশ শার্ট গায়ে। ছবির পরনে সামু সাটিন শাড়ি, নাকে হীরের নাকছাবি, ইন্টিমেট সেণ্টের গন্ধে জায়গাটা মাৎ হয়ে গেল। একগোছা রজনীগন্ধা বিছানার পাশে রাখল ছবি। মাণিকের পিছনে পেতলের দু-বাটির টিফিন ক্যারিয়ার আর ফ্লাস্ক হাতে মুকুন্দ এল। বলল—সাগরবাবুর ব্রেকফাস্ট।

ছবি নাক কুঁচকে বলল—এ কোথায় সাগরদাকে রেখেছো? শীগগীর নার্সিং হোম-এ ট্রান্সফার করো। এরকম নোংরা ওয়ার্ডে তো ভাল লোকই অসুস্থ হয়ে যায়।

মাণিক বলে—আজই ব্যবস্থা হবে, কাল ডাক্তার পালিতের

সঙ্গে কথা বলে গেছি, উনিই ব্যবস্থা করবেন। সাগর অসুস্থ হয়ে পড়লে মুকুন্দ বুদ্ধি খাটিয়ে এখানে ভর্তি করে, তারপর আমাকে ফোন করেছিল। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে, কিছু করার ছিল না।

ছবি নীচু হয়ে কমলার গায়ে হাত দিয়ে বলল—বৌদি উঠুন তো। আপনার কর্তা বড্ড দুষ্টু হয়েছেন আজকাল, কোনো বাধা-নিষেধ মানেন না। একটু শাসন করবেন তো! ডাক্তার বলেছে, ভয় নেই।

মাণিক সিন্ধুর দিকে চেয়ে বলল—তুমি সিন্ধু না?

—হ্যাঁ,

—তুমি এসময়ে কলকাতায় থাকায় ভালই হয়েছে। এ সময়টায় লোকজন দরকার। এখন কয়েকদিন থাকতে হবে কলকাতায়।

—থাকব। বলে সিন্ধু চুপ করে থাকে।

কমলা উঠে বসেছে এখন, বলল—মাণিকবাবু, ওঁকে খুব ভাল ডাক্তার দেখাতে হবে। দরকার হলে আমার সব গয়না বিক্রি করে দেব।

শুনে মাণিক হেসে বলল—গয়না! আরে দূর, আমরা এত ভিখিরি হয়ে গেছি নাকি? গয়না-টয়নার দরকার নেই বৌদি, ওসব নিয়ে ভাববেন না। আজ বিকেলেই সাগরকে নার্সিং হোমে নেওয়ার ব্যবস্থা হবে। রোগটা বাধিয়ে সাগর বড় ঝামেলায় ফেলল আমাকে। ব্যবসা আমার চেয়ে ও ঢের ভাল বোঝে। ও পড়ে থাকলে একা আমি কি যে করব!

একটু বাদেই সাগরের বিছানার চারপাশ ভরে গেল। ডাক্তার নার্স তো বটেই, অনেক ক্লায়েন্ট, সাপ্লায়ার, দুচারজন সরকারী লোকও এসে ভিড় করল। তিন-চারজন পুরোনো বন্ধু।

ডাক্তার রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করে মাণিককে বললেন—একটু সময় লাগবে। তবে আজ নার্সিং হোমে নিতে পারবেন।

কমলা বলল কতদিন লাগবে?

—এক মাস বা দু' মাস। ইট ডিপেণ্ডস—বলে ডাক্তার হেসে

যোগ করলেন—ভয়ের কিছু নেই। মাইল্ড্ স্ট্রোক। কিন্তু এর পর ডিসিপ্লিন্ড্ না হলে মুশকিল। একবার স্ট্রোক হয়ে গেলে আর নরমাল-এ ফেরা যায় না।

দুপুরের রোদ মাথায় করে ভিড় ঠেলে অনেক কষ্টে সমবায় পল্লীতে ফিরে এল কমলা আর সিন্ধু। কমলা আসতে চায়নি, বলেছে—বিকেল পর্যন্ত থেকে যাই, অত দূর থেকে যদি আসতে ফের দেরি-টেরি হয়, গাড়ি যদি বন্ধ থাকে!

সিন্ধু সে কথায় কান দেয়নি। জোর করে নিয়ে এসেছে।

এসে দেখে গনকট বাচ্চাদের নিয়ে খুব খেলছে। জয়া আর সৈকত জানে ওদের বাবার খুব অসুখ। কিন্তু শৈশব বয়স দুঃসংবাদ বহন করতে পারে না। বাবার অসুখের কথা ভুলে ওরা মোটা কাকুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে।

বাবাকে একটা চিঠি দেওয়া দরকার আজই। খেয়ে উঠে চিঠিটা লিখেও ফেলল সে। দাদার স্ট্রোকের খবর দিল না, শুধু লিখল—দাদার শরীর ভাল নয়। আমি ক'দিন পরে যাবো।

প্রায় পনেরো দিন নার্সিং হোমে রইল সাগর। তারপর ডাক্তারের মত নিয়ে কমলা আর সিন্ধু মিলে সাগরের অফিসের গাড়িতে করে নিয়ে এল তাকে। এখনো হাঁটাচলার ক্ষমতা নেই, কথা স্পষ্ট হয়নি, বাঁ চোখের পাতা ভাল করে বোজাতে পারে না সাগর। খুব অল্প বয়সেই তার স্ট্রোক হয়ে গেল।

বাড়ির ব্যবস্থা একটু পাল্টানো হয়েছে। সাগরের ঘরের মস্ত খাটে এখন সৈকত আর জয়া শোয়, মেঝেয় বিছানা পেতে পুনি। কমলার ঘরে রাখা হয়েছে সাগরকে। সেখানে কমলা দিনরাত যক্ষীর মতো তাকে পাহারা দেয়। ঘরসংসার এখন খানিকটা শ্রীহীন। পুনিই রান্নাবান্না করে। বাগানে আগাছা জন্মেছে খুব। গোয়ালে বাছুরটা প্রায়ই ছাড়া পেয়ে গরুর দুধ খেয়ে ফেলে।

ইস্কুল থেকে সাগরের সহকর্মীরা এসে একদিন দেখে গেল। চাঁদা করে তারা কিছু ফুল-ফল নিয়ে এসেছে। মাণিক প্রায়ই গাড়ি করে আসে, সঙ্গে বড় ডাক্তার। কমলার হাতে সে প্রায়ই কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে যায়। সে অনেক টাকা। এক-একবারে তিন হাজার, চার হাজার। এক মাসেই প্রায় বিশ হাজার টাকা এসে গেল কমলার হাতে। সাগরের রোজগার যে এত বেশী, অংশীদারী ভাগ যে মাসে কত হয় তা আগে জানা ছিল না কমলার। ভয়ে তার বুক ঢিপঢিপ করে।

টাকাটা লোহার আলমারিতে লুকিয়ে রাখে কমলা। বুঝতে পারে, এত টাকাই ছিল ওর সর্বনাশের মূলে। ভগবান জানেন, এত টাকা কমলা কোনোদিন চায়নি। সে সচ্ছলতা চেয়েছিল, একখানা নিজস্ব ছোট বাড়ি চেয়েছিল, দু'একটা বড়লোকী জিনিস চেয়েছিল। তা বলে রাশি রাশি টাকার বৃষ্টি নয়। বেশী টাকার মধ্যে অভিশাপ থাকে।

সাগর আজকাল একটু-আধটু চলাফেরা করতে পারে। প্রায় সময়েই সিন্ধুকে ডেকে দাবা খেলতে বসে। খেলাটা নতুন শিখেছে সিন্ধুর কাছে। একটা বোর্ড আর খুঁটি কিনে আনা হয়েছে। দুই ভাই মিলে খেলে। কখনো বা বই পড়ে সাগর। বহুকাল বইপত্র পড়ার সময় ছিল না। কখনো বা একটা প্যাড আর কলম কোলে নিয়ে বসে।

এক দুপুরে তেমনি বসে ছিল সে। কমলা বেদানার রস করছিল মেঝেয় বসে। তখন কমলা বলল—শোনো, তোমার শেয়ারের অনেক টাকা মাণিকবাবু আমার হাতে দিয়ে গেছেন।

সাগর গম্ভীরভাবে বলল—হুঁ।

—কত টাকা বলো তো! কমলা হেসে জিজ্ঞেস করে।

সাগর প্যাডে চোখ রেখেই বলে—কত আর হবে! হাজার বিশ-ত্রিশ।

—ঠিক বলেছো তো। ত্রিশ নয়, কাল গুনে দেখলাম তেইশ

হাজারের কিছু বেশী। তোমার প্রতি মাসে অত রোজগার হয়?

সাগর একটু বিরক্ত হয়ে বলে—হয়, কেন?

—এমনি জিজ্ঞেস করলাম। রাগ করলে?

—এখন টাকার কথা শুনতে ভাল লাগছে না।

—তবে আর বলব না। রসটুকু খেয়ে নাও তো।

সাগর তেতো মুখ করে রসটা গিলে কাপ ফিরিয়ে দিয়ে বলে—কমলা, তুমি নামে লক্ষ্মী!

—তাই তো।

—সেইজন্য টাকার কথা তোমার মুখে মানায় না।

এটা হয়তো একটা ভালবাসার কথা। এই ভেবে কমলা খুশী হল। তখন আচমকা সাগর বলে—আমি কিন্তু লক্ষ্মীর চেয়ে সরস্বতীকেই বেশী চেয়েছিলাম।

কোলের ওপর খোলা প্যাড আর হাতে কলম নিয়ে সাগর অন্য মনে বসে থাকে অনেকক্ষণ। এক অক্ষরও লেখে না, লিখতে পারে না। আড়াল থেকে কমলা দেখে যায়, সিন্ধু দেখে যায়।

বারো

বুকুনের কথা সিন্ধুর কি মনে হয় না?

খুব হয়। কিন্তু সিন্ধুর চরিত্রে একটা খুব জোরালো কপাট আছে, যেটা সে বন্ধ রাখতে পারে। ভাবপ্রবণতার হাওয়া তাকে বড় একটা ভাসিয়ে নিয়ে যায় না কাটা ঘুড়ির মতো। আর আছে তার প্রবল আত্মসম্মান বোধ।

সাগর কিছু সুস্থ হয়ে উঠলে একদিন সিন্ধু ভাবল—যাই তো, বুকুনকে একবার দেখে আসি!

বিকেলের আলো থাকতে থাকতেই একদিন সিন্ধু দীনেন্দ্র স্ট্রীটের সেই বাড়িতে এল। আশ্চর্য, দরজা খুলল সেই মেয়েটাই যে আগের

বার খুলেছিল। সাদা খোলের একটা শাড়ি পরনে, লাল ব্লাউজ, এলোচুলের অন্ধকারের মাঝখানে মুখখানা ফুলের মতো ফুটে আছে। এক পলক তাকালেই মন ভাল হয়ে যায়।

—বুকুন নেই ?

মেয়েটা সিন্ধুর দিকে একটু তাকিয়ে একটু চেনা-অচেনার দ্বন্দ্বে পড়েছিল বোধ হয়। সিন্ধুকে সে দেখেছে, কিন্তু মনে করতে পারছে না।

—বুকুনদি ? ওঃ, আপনি সেই শিলিগুড়ির, না ?

—হ্যাঁ।

—আসুন।

সিন্ধু গিয়ে সেই ঘরটায় বসল। মেয়েটা চলে গেল ভিতরে।

অনেকক্ষণ কেউ এল না। বাড়িটা খুব নিস্তব্ধ লাগছে। একা বসে থাকতে সিন্ধুর খুব অস্বস্তি লাগছিল। আর বার বার সে কেন যেন যে মেয়েটি দুদিন তাকে দরজা খুলে দিল তার কথাই ভাবছে। বড় শ্রীময়ী মেয়েটি।

অনেকক্ষণ বাদে পর্দার আড়াল থেকে আচম্‌কা বুকুন একদম সামনে এসে দাঁড়াল। কোনো শব্দ হয়নি, তাই বড় চম্‌কে গিয়েছিল সিন্ধু।

—এতদিন পরে এলে ? বুকুন কেমন এক স্বরে বলল। যেন ইতিমধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে তার জীবনে, সিন্ধু বড় দেরিতে এসেছে।

সিন্ধু মুখ তুলে অবাক। বুকুন আরো কি সুন্দর হয়েছে দেখতে। হলুদে মাখানো চমৎকার গায়ের রঙ হয়েছে তার। হয়তো রোজ স্নানের সময়ে হলুদ মাখে। স্বাস্থ্য ঝলমল করছে। সেই রোগা মেয়েটাকে এর মধ্যে খুঁজে পাওয়াই যায় না।

সিন্ধু বলে—দাদার খুব অসুখ গেল বুকুন। আমি সেই থেকে কলকাতায় আছি। কিন্তু আসবার সময় হয়নি।

—অসুখ ! বলে ভ্রূ কুঁচকে যেন একটু ভাবল বুকুন। তার পর বলল—আমার যা হওয়ার তা হয়ে গেল।

একটা হতাশ ভাবে মাখানো এই কথা শুনে সিন্ধুর বুকটা একবার চমকে ওঠে। সে বলল—কি হয়েছে ?

—শুনতে চাও ? বলে ম্লান হাসল বুকুন। বলল—সে একটা গল্প !

—বলো, শুনি ?

—তুমি রাগ করবে না বলো !

—কি জানি ? তবু বলো, রাগ আমি চেপে রাখতে পারি বুকুন। কিন্তু আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তুমি কি অন্য কারো সঙ্গে ইনভল্‌ভড হয়ে গেছ ?

বুকুন মুখটা নামিয়ে নিল। খাটের বিছানায় বসে রইল নতমুখী। তারপর আঁচল তুলে চোখ মুছে অস্পষ্ট গলায় বলল—আমার খুব দোষ নেই। সবাই এমন করে রাজী করাল।

—কি হয়েছে বুকুন ?

—আমার রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেল ক'দিন আগে।

সিন্ধু থমকে যায়। এমনটা সে আশা করেনি। হয়ে গেল! অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে বলল—কার সঙ্গে ?

—এ বাড়িতে আসত ও। পারিজাত রায়। একসঙ্গে সিনেমায় গেছি, বেড়িয়েছি। ওর ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার কথা হচ্ছিল। এম বি. বি. এস. পাস করেছিল দু'বছর আগে, এখন এফ আর.সি. এস করতে যাচ্ছে। ওর মা-বাবার ইচ্ছে বিয়ে করে যায়। ও তাই একদিন আমাকে সব খুলে বলল। বিশ্বাস করো, আমি রাজী হইনি। কিন্তু কথাটা উঠতেই এ বাড়ির সবাই হৈ-হৈ করে ধরল আমাকে। সকলের বিরুদ্ধে যেতে আমি কি পারি ? সোস্যাল ম্যারেজের সময় ছিল না, মলমাস পড়ে গেছে। তাই রেজিস্ট্রি হয়ে গেল। এক বছর বাদে এসে সামাজিক মতে বিয়ে করে নিয়ে যাবে আমাকে।

বুকুনের গলায় যথেষ্ট দুঃখের ভাব ছিল, চোখে জল ছিল, একটা অসহায়তাও ফুটে উঠেছিল ওর মুখে। তবু সিন্ধুর কেবলই মনে হয়, ভিতরে ভিতরে বুকুনের একটা আনন্দের বিস্ফোরণ ঘটে গেছে!

সিন্ধুর বুকটা অন্ধকার হয়ে গেল।

তবু হেসে বলল—বাঃ, এ কেমন বিয়ে! খাওয়ালে না তো!

বুকুন জলভরা চোখ তুলে বলে—ঠাট্টা করছো? করো। তোমার তো ঠাট্টা করারই কথা।

সিন্ধু কাঠ-হাসি হেসে বলে—বুকুন, আমার তো এমনিতেও চান্স ছিল না। যাক গে, ভেবো না। আজকাল কেউ এসবের জন্য গলায় দড়ি দেয় না। আজ উঠি।

বলে উঠতেই যাচ্ছিল সিন্ধু, ঠিক এসময়ে পর্দাটা সরিয়ে সেই মেয়েটা ঘরের মধ্যে আসে। মনে হয় এতক্ষণ পর্দার ওপাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। ঘরে এসে সিন্ধুকে বলল—একটু বসুন। চা আনছি।

—না, তার দরকার নেই।

মেয়েটা সামান্য হেসে বলল—ওমা, আপনি কি আমাদের ওপর রাগ করেছেন?

সিন্ধুর ভিতরে তৎক্ষণাৎ এক হিংস্রতা জেগে ওঠে। সে ফুঁসে উঠে রুক্ষ গলায় বলল—কেন, রাগের কি দেখলেন?

—দেখছি, খুব রেগে গেছেন। আগের দিন যখন এসেছিলেন তখন আমরা ভাল আপ্যায়ন করতে পারিনি বলে রাগ করেননি তো?

সিন্ধু তার রাগী চোখে চেয়ে থাকে একটু।

মেয়েটা ভয় পায় না। বলে—আপনার রাগের গল্প অনেক শুনেছি। জলপাইগুড়িতে একবার নাকি ভীষণ কাণ্ড করেছিলেন!

সিন্ধু নিভে যায়। বসে বলে—ওঃ, সে-সব বলেছে বুঝি বুকুন?

—হ্যাঁ। আরো অনেক কথা বলেছে। আমি কিন্তু ভীষণ দুঃখ পেয়েছি বুকুনদির ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ায়।

সিন্ধু কিছু বলল না। এই মেয়েটা বড্ড পাকা।

বুকুন একটু সামলে নিয়ে বলে—সিন্ধুদা, এ হচ্ছে আমার মাসতুতো বোন গৈরিকা। পার্ট টু দিচ্ছে। ভাল নাচতে জানে। সি-এল-টিতে এক সময়ে—

গৈরিকা বলল—যাঃ!

বলে চলে গেল। মুহূর্তের মধ্যেই এক প্লেট মিষ্টি আর চা হাতে এসে বলল—বুকুনদি তেমন স্ট্রং-মাইণ্ডেড নয়। ওর জায়গায় আমি হলে এ বিয়েতে কেউ রাজী করাতে পারত না। কিন্তু বুকুনদি কেঁদে কেটে, ভয় খেয়ে কি রকম যেন হয়ে গেল। অবশ্য পারিজাত খুব ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে!

সিন্ধু এসব ঘটনার অর্থ জানে। বুকুনের যে ব্যক্তিত্বের জোর নেই এটাও কি সে আগেই জানত না?

সিন্ধু খাবারের প্লেট ছুঁল না। কয়েক চুমুক চা খেয়ে সে উঠে পড়ল। জীবনটাকে এবার অন্য এক রকম করে গড়তে হবে। বুকুনকে ঘিরে সে জীবনের একটা ছক তৈরী করেছিল। এখন বুকুন তার জীবনে রইল না। ছকটা না পাল্টে কি করে সিন্ধু! তার খুব ইচ্ছে করছে শিলিগুড়ি ফিরে যেতে। গনফট রোজ তাগাদা দিচ্ছে। ওর বাড়ি থেকে চিঠি আসছে রোজ।

বাড়িতে ঢুকবার সময়ে সিন্ধু দেখে ওপরের বারান্দায় দাদা বসে আছে বেতের চেয়ারে। মুখ নিচু করে বোধ হয় কোলের ওপর প্যাডে কিছু লিখছে গম্ভীর মনোযোগে। তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। দাদা আলো না জ্বেলে এই প্রায়ান্ধকারে লিখছে কি করে?

সিন্ধু উঠে এল ওপরে। বারান্দায় এসে আলোটা ফট্ করে জ্বালতেই চমকে উঠে সাগর বলে—কে?

—আমি।

সাগর মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখল একটু। বলল—আলোটা নিভিয়ে দে।

সিন্ধু নিভিয়ে দিল। সাগর আর তার দিকে চেয়েও দেখল না। বেশ জমাট অন্ধকার নেমে আসছে। তবু সাগর একমনে প্যাডে

কি লিখে যাচ্ছে।

সিন্ধু দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখল একটু। বহুকাল আগে দাদা এইভাবেই লিখত। হাঁটু তুলে বসে, কোলে প্যাড নিয়ে। বাহ্যজ্ঞান থাকত না। বৌদি কত বকে বকে সংসারের কাজে পাঠাত, বাজার করতে বা লণ্ড্রীর কাপড় আনতে।

সিন্ধু ঘরে এসে দেখল বৌদি নিঃসাড়ে চলাফেরা করছে। সিন্ধুকে দেখে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে নীচু গলায় বলে—সিন্ধু, চুপ! ও আজ লিখছে।

—কি লিখছে?

—কবিতা। বলে খুব উজ্জ্বল হাসি হাসল কমলা।

সিন্ধুর ভারী মজা লাগে। সাগর কবিতা লিখলে আগে কোনো দিন খুশী হত না কমলা। আজ ভিন্ন পরিস্থিতিতে দান উল্টে গেছে।

—লিখছে মানে? সিন্ধু জিজ্ঞেস করে—কবিতা আসছে তো? নাকি পরে আবার কবিতা হল না বলে পাগলামি করবে?

—না রে, ওর মুড আমার চেয়ে কেউ ভাল চেনে না। কবিতা যখন ওর মাথায় আসে তখন এরকম নিঃঝুম পাথরের মতো হয়ে যায়। বহুকাল এরকম মুড দেখিনি ওর। এতকাল কেবল কবিতার পাগলামি করেছে। কিন্তু আজ ও অন্যরকম, ঠিক সেই আগের মতো।

সিন্ধু একটু তাকিয়ে থাকল কমলার দিকে। হঠাৎ বলল—বৌদি, আগের মতো সব কিছু কিন্তু নেই। তুমি খুব পাল্টে গেছ।

—কি বলছিস!

—শোনো, দাদা কবিতা লিখছে বলে তুমি অমন কাঁটা হয়ে থেকো না। দাদা যদি টের পায় যে তোমরা দাদার কবিতা লেখার জন্য সবাই শ্বাস বন্ধ করে আছ তবে আবার ওর মেজাজ নষ্ট হয়ে যাবে। ওর কবিতাকে প্রকাশ্যে অত ইম্‌পর্ট্যান্স দিতে যেও না। বরং মাঝে মাঝে ওকে ডিস্টার্ব করো। কবিতার মাঝখানে

গিয়ে এক-আধটা ফরমাশ করে দেখো, তাতেই ও আগের মেজাজটা ফিরে পাবে।

একটু দ্বিধায় পড়ে গিয়ে কমলা বলে—বলছিস!

—হ্যাঁ, বৌদি। একটু ভয় করছে তোমার, তবু ওরকম করাটা দাদার পক্ষে দরকার।

কমলা ভাবল।

সন্ধ্যের পর সাগর বারান্দায় বাতি জ্বেলে নিবিষ্ট হয়ে বসে আছে কবিতার খাতা নিয়ে। তখন কমলা এসে বলল—ওগো, যাও তো ইলেকট্রিক মিস্তিরিকে একটু ডেকে আনো। হীটারটা গোলমাল করছে!

সাগর একটা বিরক্তির 'আঃ' করল। রাগী চোখে তাকাল কমলার দিকে।

—যাও না গো। কমলা বলে। ভিতরে ভিতরে ভয়ে তার বুক ঢিপঢিপ করে।

সাগর উঠে পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। একটু বাদে মিস্তিরি নিয়ে ফিরে আবার লিখতে বসে গেল। তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, সে যেন খুশী হয়েছে। সে যেন কিছু একটা খুঁজে পাচ্ছে জীবনের মধ্যে। খুব চিকমিক করছে চোখ। সমস্ত মুখে বিষয়চিন্তার যে রেখাগুলি পড়েছিল তা মুছে গিয়ে এক কোমল কল্পনাপ্রবণতার লাবণ্য ফুটে উঠেছে।

কমলা একটা খেলা খুঁজে পেয়েছে। পরদিনও সে সাগরের কবিতা লেখার মাঝখানে তাকে ডেকে মাছ কিনতে পাঠাল।

সাগর আজকাল চলাফেরা করতে পারে। তাছাড়া বাঁধা রিকশা এসে নিয়ে যায়।

মাছ এনে সাগর লিখতে বসে।

কমলা এসে বললে—ইস্কুলে কবে থেকে যাবে?

—কেন?

—বাঃ, চাকরি না করলে, কাজ না করলে সংসার কি এমনিতে

চলবে ?

এরকম করে কতকাল কমলা কিছু বলেনি। সাগর বিরক্তির সঙ্গে বলে—বলো তো আজই যাই। পরে শরীর খারাপ করলে কাঁদতে বোসো না।

—না, না, আজ নয়। কমলা ভয় পেয়ে বলে। তারপর হেসে বলে—তবে চাকরিটা ছেড়ো না যেন।

—আচ্ছা। বলে সাগর দ্রুত লিখতে থাকে। সিগারেট ধরায়।

সাগরের ঘর থেকে সিন্ধু চুপি চুপি ভাল আসবাবপত্র সরিয়ে দিয়েছে নীচের ঘরে। পুরোনো খাট, ডেস্ক দিয়ে নতুন করে সাজিয়েছে। অবশ্য এ ঘরে এখন সাগর থাকে না। থাকে জয়া আর সৈকত। সাগর কমলার ঘরে শোয়।

সিন্ধু কমলাকে বলেছে—বৌদি, এই সিস্টেমই বজায় রেখো। ছেলেমেয়েরা ঐ ঘরেই থাকবে। তুমি দাদাকে আলাদা থাকতে দিও না।

কমলা সিন্ধুর দিকে চেয়ে কেঁদে ফেলল, বলল—তুই এত পাকা মাথার লোক কবে থেকে হলি সিন্ধু! সেদিনের পুঁচকে ছেলে, কিন্তু যেন জ্যাঠামশাইয়ের মতো সব বুঝে গেছিস !

—আমি কবি নই বৌদি। নিতান্তই প্রোজ।

—তোর খুব ভালো হবে সিন্ধু, দেখিস। খুব ভালো হবে তোর।

সিন্ধু ঠাট্টা করে বলে—যে ভাল করেছো কালী, আর ভালতে কাজ নাই···

টানা পনেরো দিন সাগর অজস্র কবিতা লিখল। যেন পাথর কাটিয়ে নির্ঝরিণীর মুক্তি ঘটেছে। তার জলধারার শেষ নেই। এই পনেরো দিন কমলা কবিতার মাঝে মাঝে এসে ফরমাশ করেছে, বাইরে পাঠিয়েছে সাগরকে। সাগরের মুখে সেই সম্মোহিত কবিতা-

মুগ্ধতা আবার ফিরে এল বুঝি।

তারপর সাগর ইস্কুলে যাওয়া শুরু করল। ব্যবসার দেখাশুনে আবার শুরু হল।

একদিন রাত্রিবেলা কমলাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে সা বলল—শোনো কম্‌লি, আর আমি কিন্তু রাশি রাশি টাকা রোজগ করব না।

—কেন?

—ব্যবসা ভাগ করে নিলাম। এখন মাণিক আর আ আলাদা। মাণিকের ক্যাপিটালে ব্যবসা করতাম। টা রেখে আর টাকা চেখে লোভ বড় বেড়ে গিয়েছিল। এখন ব্যব করব ছোট্ট করে, কম টাকায়। সারাদিন টাকা রোজগার কর মানেই হয় না। কবিতা লেখার সময়ও তো চাই।

—ঠিক কথা। এতদিনে সেটা বুঝলে!

—তবু তো বুঝলাম। কমলি, আমার কবিতা আবার ছাপ হচ্ছে। একটা বই বেরোবে।

কমলা গাঢ় গলায় বলে—শোন, সিন্ধুকে কেন ব্যবসা ছে দাও না! ওর মতো পাকা মাথা তোমারও নেই। তুমি আগে মতো মাস্টারি আর কবিতা নিয়ে থাক।

সাগর অবাক হয়ে বলে—এ কি বলছ? তোমার মুখে এ কথা?

—নয় কেন? অনেক কষ্ট পেয়ে তো বুঝেছি আমার টাক চেয়ে তোমাকে অনেক বেশী দরকার।

সাগর উঠে বসল উত্তেজনায়। বলল—সিন্ধুটার কথা কথে মনে হয়নি। ঠিক বলেছো তো। আমি তো ওকেই পার্টন করে নিতে পারি।

—নেবে?

—নিশ্চয়ই। ওকে এক্ষুনি ডাকি।

—আজ থাক্ না। সকালে বরং—

—না, না। এক্ষুনি। সিন্ধু! সিন্ধু! বলে ডাকতে ডাকতে সাগর মশারি থেকে বেরিয়ে গেল।

বড় সুখে শুয়ে চেয়ে থাকে কমলা। সেই পাগলাটে, ক্ষ্যাপাটে সাগর আবার ফিরে এসেছে তার কাছে! যখন যা মনে হবে তখনই তাই করা চাই। একবার জ্যোৎস্নায় বসে ভাত খেয়েছিল, রাত বারোটার পর কমলাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল অন্যবার। সেই লোকটা মাঝখানে খুব হিসেবী হয়ে গেল, বড়লোক হল, ঠাণ্ডা মেরে গেল। ভগবান আবার সেই কবি স্বামীটিকে তার ফিরিয়ে দিয়েছেন।

কমলা বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদে। এত সুখের কান্না কে[illegible] দেনি।

শেষ